ছাদের সমস্যা? ঘরে জল পড়ছে?
১০-১৫ বছর নিশ্চিত থাকুন।
গ্যারান্টি যুক্ত
ম্যাক্রোপেষ্ট
লাগান, ছাদ বাঁচান।
৯৩৩৯৭ ৭৭৫৩১

কিচির মিচির

আবৃত্তি ও শ্রুতি নাটক চর্চাকেন্দ্র
PANTAR
যোগাযোগ : ৯৪৭৭৮ ০৭০৭৭,
৯৪৩৩২৬৪৩৯৪

১ বর্ষ ৪ প্রস্তুতি সংখ্যা | ১ জুন ২০১৪, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ | মোট ১২ পাতা | মূল্য : ১০ (দশ) টাকা

ফুটবলের মহারণ

সুরজিৎ সেনগুপ্ত

তাপমাত্রার পারদ চড়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনার পারদও চড়ছে। মাঝে আর মাত্র হাতেগোনা কয়েকটি দিন। তারপরেই শুরু বিশ্ব ফুটবলের মহারণ। ৩২টি দেশ, ৬৪টি ম্যাচ আর মাত্র একটি কাপ। স্বাভাবিক কারণেই মহারণ। সমস্ত ভারতবাসীর সঙ্গে আমরা বাঙালিরাও মেতে থাকবো ফুটবলের এই সুন্দর অসাধারণ ছন্দে।

যারা তোমরা ফুটবল খেলা দেখো তারা একটা 'অ্যাডভান্টেজ' নিয়ে খেলা দেখতে বসো। কী বলো তো সেই অ্যাডভান্টেজ? সেটি হচ্ছে আমাদের নিজস্ব দল নেই, কারণ ভারত এই প্রতিযোগিতায় খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। ফলে নিজের দলের হেরে যাওয়া বা দল জিতবে কিনা এই দোলাচলে আমার মতো তোমাদেরও দুলতে হয় না। অবশ্য তোমাদের সঙ্গে আমি একমত, একটা যদি টানাপোড়েন খেলার মধ্যে না থাকে তাহলে ভালো লাগে না। সেইজন্যেই আমরা কোনো না কোনো দলের সমর্থক হই।

(এরপর ৬ পাতায়)

এভারেস্ট জয়ীর ডায়েরির পাতা থেকে

পর্বতারোহণের সেকাল ও একাল

এভারেস্ট চূড়ায় তেনজিং। হিলারির তোলা বিখ্যাত ছবি। কোডাক-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

দেবদাস নন্দী

৬০ বছর আগে যে পথে এডমুন্ড হিলারি এবং তেনজিং নোরগে হেঁটেছিলেন, যে উপত্যকা পেরিয়ে পা রেখে ছিলেন পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্টের চূড়ায়, ভাবতে বেশ ভালোই লাগছে যে আমিও সেই পথের পথিক। কলকাতা থেকে কাঠমাণ্ডু হয়ে এভারেস্ট জয়ের জন্য রওনা হয়েছিলাম এক বিশাল টিম, বিশাল আশা নিয়ে। অভিযানের বর্ণনা দেওয়ার আগে প্রথমেই আমার প্রচেষ্টা হবে এভারেস্টের মতো পাহাড় চূড়ায় অভিযান করতে গেলে সঙ্গে কী কী থাকা প্রয়োজন তার একটা তথ্য তুলে ধরার। একই সঙ্গে প্রথম সফল এভারেস্ট অভিযানে হিলারি এবং তেনজিং যে সমস্ত সরঞ্জাম ব্যবহার করেছিলেন তার সঙ্গে বর্তমান অভিযানে ব্যবহৃত সরঞ্জামের একটা তুলনামূলক আলোচনা হাজির করতে।

১নং ছবিতে দেখা যাচ্ছে এডমুন্ড হিলারি এবং তেনজিং নোরগে, দুই প্রথম এভারেস্ট জয়ী, বরফের মাঝখান দিয়ে কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে এগিয়ে চলেছেন। এই জায়গাটির উচ্চতা কমবেশি ২৭,৩০০ ফুট। ১৯৫৩ সালে হিলারি এবং তেনজিংয়ের পিঠে যে ব্যাগ দুটি ছিল তার ওজন প্রায় ৪৪ পাউন্ড। আজকের দিনে আমরা যে অভিযানে চলেছি সেই অভিযানের প্রতিটি সরঞ্জামই অত্যন্ত হালকা, ফলে পিঠে থাকা ব্যাগের ওজন হিলারি বা তেনজিংয়ের ব্যাগের ওজনের তুলনায় অর্ধেক বা তারও কম।

এবারে আসি ব্যাকপ্যাক বা সোজা কথায় পিঠ্ঠুর প্রসঙ্গে। তোমরা অনেকেই স্কুলে যাওয়ার সময় পিঠের ব্যাগের ভারে নুয়ে পড়ো। পাহাড়ে চড়বার সময় পিঠের ব্যাগ এমন হওয়া প্রয়োজন যেটি নিজে হবে হালকা কিন্তু অনেক ওজন বহন করতে সক্ষম অর্থাৎ শক্তপোক্ত। হিলারি-নোরগের সময় ব্যাকপ্যাক-এর বাইরের কাঠামো ছিল De Regueur। কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের কাঠামোগুলো ছিল আশ্চর্য রকমের হালকা। বর্তমানে যে ব্যাগগুলি ব্যবহৃত হয় সেগুলি 'হাইটেক' তন্তু দিয়ে তৈরি। এধরনের তন্তু গাড়িতে এয়ারব্যাগ তৈরিতে কাজে লাগে। পাশাপাশি এই ব্যাকপ্যাকগুলিতে অনেক পকেট, 'লুপ' থাকায় সরঞ্জাম বহন করতে সুবিধা হয়। এখনকার গাড়ি যেমন 'এয়ারোডায়নামিক' পদ্ধতিতে তৈরি হয় তেমনই বর্তমান ব্যাকপ্যাকগুলির আকৃতিও ট্রেক করবার উপযোগী করে তৈরি।

আসি শিরস্ত্রাণের কথায়। আমরা হেলমেট বলেই এই সরঞ্জামটিকে সবাই জানি। ১৯৫৩ সালে এডমুন্ড হিলারি বা তেনজিং নোরগে কোনো হেলমেট ব্যবহার করেননি। বর্তমান অভিযাত্রীরা প্রত্যেকেই হেলমেট ব্যবহার করেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, একটি

ব্ল্যাক ডায়মন্ড হাফ-ডোম হেলমেটের ওজন ১ পাউন্ডেরও কম (৩৪৫ গ্রাম)। এই হেলমেটটি অভিযাত্রীর মাথাকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রাখে। এর মধ্যে রয়েছে 'এবিএস শেল' এবং 'পলিস্টিরিন ফোম'।

বরফের মধ্যে চলতে গেলে দরকার অতি প্রয়োজনীয় একটি জিনিস - আইস এক্স বা বরফ কুঠার। ১৯৫৩ সালে হিলারি এবং তেনজিং যে বরফ কুঠার ব্যবহার করেছিলেন সেটি তৈরি করেছিল ফ্রান্সের ক্লদিয়াল সাইমন্ড। এটি 'ফোর্জড' স্টিল দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। এর হাতলটি ছিল 'ইউরোপিয়ান অ্যাশ উড'-এর। বর্তমানে যে বরফ কুঠারগুলি ব্যবহৃত হয় সেগুলির ওজন মাত্র ১২ আউন্স! এগুলি অ্যালুমিনিয়াম এবং স্টেনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি, মাত্র ২০ ইঞ্চি লম্বা, যা তেনজিংয়ের সময়ের থেকে প্রায় ১ ফুট ছোটো কিন্তু ক্ষমতা তুলনাহীন।

এতক্ষণ পাহাড়ে চড়ার কয়েকটি সরঞ্জাম নিয়ে তোমাদের জানালাম। কিন্তু শুধু সরঞ্জাম নিয়ে কথা বললে অনেক সময় সেটি পড়তে ভালো নাও লাগতে পারে। তাই আগামী সংখ্যায় আবার সরঞ্জাম নিয়ে কথা বলা যাবে।

এভারেস্টকে নিয়ে বহু 'মিথ' বা গল্প গোটা বিশ্ব জুড়ে চালু আছে। এইরকম একটি মিথ হচ্ছে - এভারেস্টে চড়া অত্যন্ত শক্ত কাজ। তোমাদের জানিয়ে রাখি এভারেস্ট সত্যিই খুব উঁচু, শেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২৯,০৩৫ ফুট। এখনও পর্যন্ত প্রায় ২৫০ জন মানুষ এভারেস্ট অভিযানে গিয়ে মারা গিয়েছেন। ১৯২৪ সালে জর্জ মেলরির নেতৃত্বে অভিযানের সময় সাতজন শেরপা মারা গিয়েছিলেন। সেখান থেকে শুরু। এইরকম যেকোনো 'হাই অলটিচ্যুড' অভিযানে শুধুমাত্র ধ্বসে চাপা পরে মৃত্যু-সম্ভাবনাই থাকে না, থাকে আরো অন্যান্য বিপদ - 'গ্লেসিয়াল আইস কোলাপ্স', প্রচণ্ড তুষার ঝড় ইত্যাদি। এরসঙ্গে থাকে শারীরিক সমস্যা - ফুসফুসে বা মস্তিষ্কে জল জমে যাওয়া, স্ট্রোক, ডিসেন্ট্রি, হাইপোথার্মিয়া বা শরীরের তাপ ধরে রাখার অক্ষমতা, ফ্রস্ট বাইট, চোখের সমস্যা ইত্যাদি।

তবু এত অসুবিধা থাকলেও পাহাড়ে চড়া খুব শক্ত কাজ নয়। ১৯৫৩ সালে প্রথম এভারেস্ট বিজয়ের পর থেকে প্রায় ৫,০০০ মানুষ এভারেস্টের শীর্ষে উঠেছেন। ডেভ হান নামের গাইড ভদ্রলোকটি এখনো পর্যন্ত ১৫বার পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গে পা রেখেছেন। অন্যদিকে আপা শেরপা, ফুরবা তাসি শেরপা এখনো পর্যন্ত ২১বার করে এভারেস্টের চূড়ায় উঠেছেন। কিন্তু তুলনায় পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ 'কে টু' বা গডউইন অস্টিন অভিযান অনেক বেশি দুর্গম। এভারেস্টের লাগোয়া মাউন্ট নুপৎসে অভিযানও এভারেস্টের থেকে দুর্গমতর। নুপৎসে অভিযানে ক্যাম্প করবার জায়গা প্রায় নেই বললেই চলে। সেই সমস্ত বিচার করে তাই বলা চলে এভারেস্ট অভিযান মোটেই দুর্গমতম নয়।

বিশ্বের কাপ

কাশীনাথ ভট্টাচার্য

বিশ্বে কতগুলো দেশ আছে?

১৯৫টি স্বাধীন দেশ। সঙ্গে আরো ৬০টি পরাধীন বা পরের উপর নির্ভরশীল এবং ৫টি বিতর্কিত ভূখণ্ড। সব মিলিয়ে ২৬০টি।

ফুটবলের বিশ্বকাপে কতগুলো দেশ অংশ নেয়?

এবার বিশ্বকাপ হচ্ছে ব্রাজিলে। মূল পর্বে, মানে ব্রাজিলে গিয়ে খেলবে ৩২টি দেশ। কিন্তু এই ‘৩২ দেশ’-এ পৌঁছানোর জন্য শুরুতে ছিল ২০৩টি দেশ, সঙ্গে আয়োজক ব্রাজিল। মানে, মোট ২০৪টি দেশ। ২৬০টি দেশের মধ্যে ২০৪টি দেশ অংশ নিয়েছিল বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে। তাই, ফুটবলের বিশ্বকাপই আসলে বিশ্বের কাপ। ক্রিকেটের বিশ্বকাপে খুব বেশি হলে ১৪-১৬টি দেশ খেলে। তাই ক্রিকেটের বিশ্বকাপকে ‘বিশ্ব’কাপ বলাই যায় না।

ফুটবলের বিশ্বকাপ কবে শুরু হয়েছিল?

১৯৩০ সালে। প্রথমবার খেলা হয়েছিল উরুগুয়েতে। কেন উরুগুয়ে? তখন ফুটবলে উরুগুয়েই ছিল শ্রেষ্ঠ দল। পরপর দু’বার, ১৯২৪ এবং ১৯২৮ সালে, অলিম্পিকে সোনা জিতেছিল উরুগুয়ের ফুটবল দল। তাই ফিফা যখন সিদ্ধান্ত নেয় যে, ফুটবলের জন্য আলাদা করে বিশ্বকাপ হবে, উরুগুয়ের দাবি ছিল আয়োজক হওয়ার। ফিফা সেই দাবি অগ্রাহ্য করতে পারেনি। আর প্রথম বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে উরুগুয়েও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিল। ফাইনালে হারিয়েছিল পড়শি দেশ আর্জেন্টিনাকে।

ব্রাজিলে এবার কততম বিশ্বকাপ?

২০-তম। এর আগের বিশ্বকাপগুলি হয়েছিল যথাক্রমে - ১৯৩০ (উরুগুয়ে), ১৯৩৪ (ইতালি), ১৯৩৮ (ফ্রান্স), ১৯৫০ (ব্রাজিল), ১৯৫৪ (সুইৎজারল্যান্ড), ১৯৫৮ (সুইডেন), ১৯৬২ (চিলি), ১৯৬৬ (ইংল্যান্ড), ১৯৭০ (মেক্সিকো), ১৯৭৪ (পশ্চিম জার্মানি), ১৯৭৮ (আর্জেন্টিনা), ১৯৮২ (স্পেন), ১৯৮৬ (মেক্সিকো), ১৯৯০ (ইতালি), ১৯৯৪ (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র), ১৯৯৮ (ফ্রান্স), ২০০২ (জাপান-দক্ষিণ কোরিয়া), ২০০৬ (জার্মানি), ২০১০ (দক্ষিণ আফ্রিকা)। আয়োজক দেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ১৯৩০, ১৯৩৪, ১৯৬৬, ১৯৭৪, ১৯৭৮ এবং ১৯৯৮ সালে– মাত্র পাঁচবার।

কোন দেশ সবচেয়ে বেশিবার জিতেছে ফুটবলের বিশ্বকাপ?

ব্রাজিল। জিতেছে পাঁচবার। প্রথম ১৯৫৮ সালে। তারপর ১৯৬২, ১৯৭০, ১৯৯৪ এবং ২০০২ সালে। ব্রাজিলের পর সবচেয়ে বেশিবার বিশ্বকাপ যে দেশ ঘরে তুলেছে সেই দেশটি হল ইতালি, চারবার

– ১৯৩৪, ১৯৩৮, ১৯৮২ এবং ২০০৬ সালে। তারপরে রয়েছে জার্মানি। জয়ী হয়েছিল ১৯৫৪, ১৯৭৪ এবং ১৯৯০। দু’বার করে বিশ্বকাপ জিতেছে উরুগুয়ে (১৯৩০, ১৯৫০), আর্জেন্টিনা (১৯৭৮, ১৯৮৬)। আর, একবার করে জয়ী দেশের তালিকায় আছে ইংল্যান্ড (১৯৬৬), ফ্রান্স (১৯৯৮) ও স্পেন (২০১০)। ইউরোপের দেশগুলি ১৯ বারে জিতেছে ১০ বার, লাতিন আমেরিকার দেশগুলি ৯ বার।

প্রথম থেকেই কি বিশ্বকাপ বলা হত?

বিশ্বকাপ যখন শুরু হয়েছিল ১৯৩০ সালে, প্রতিষ্ঠাতা জুলে রিমে-র নাম অনুসারে কাপটির নাম ছিল জুলে রিমে ট্রফি। বলা হয়েছিল, তিনবার যদি কোনো দেশ এই ট্রফি জিততে পারে, চিরতরে নিজেদের দেশে নিয়ে যেতে পারবে জুলে রিমের সোনার পরীকে। ১৯৫৮, ১৯৬২ ও ১৯৭০ সালে জেতায় ব্রাজিল চিরতরে নিয়ে গিয়েছিল জুলে রিমে ট্রফি। তবে, পরে সেই ট্রফি চুরি হয়ে যায় ব্রাজিল থেকে। আশঙ্কা, সোনার লোভে চুরি করা ট্রফিটি গলিয়ে ফেলেছে চোরেরা। আর, ১৯৭০ সালে চিরতরে ব্রাজিল ট্রফিটি নিয়ে যাওয়ার পর, এখন যে বিশ্বকাপটি দেখা যায়, তা দেওয়া শুরু হয়েছিল বিজয়ী দলগুলিকে। এবার ফিফা আর তেমন কোনও নিয়ম করেনি যে, তিনবার বা পাঁচবার জিতলে ট্রফি নিয়ে যাওয়া যাবে চিরতরে!

এবার ব্রাজিলে মোট কটি দেশ খেলবে?

মোট ৩২ দেশ। ব্রাজিলেই যেহেতু বিশ্বকাপ হবে, বাছাইপর্বে খেলতে হয়নি। বাকি ৩১ দেশকে বাছাইপর্ব পেরিয়ে আসতে হয়েছে। ফিফা বিশ্বকে ভেঙেছে ছ’টি অঞ্চলে। ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর ও মধ্য আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, এশিয়া, আফ্রিকা ও ওসিয়ানিয়া। এবার বিশ্বকাপে ইউরোপ থেকে খেলবে ১৩টি দেশ - স্পেন, নেদারল্যান্ড, ইতালি, জার্মানি, ইংল্যান্ড, পর্তুগাল, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ক্রোয়েশিয়া, রাশিয়া, সুইৎজারল্যান্ড, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা এবং গ্রিস। দক্ষিণ বা লাতিন আমেরিকার ৬টি - ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া, চিলে, ইকুয়েডর ও উরুগুয়ে। উত্তর ও মধ্য আমেরিকার ৪টি - আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কোস্টারিকা, হন্ডুরাস, মেক্সিকো। এশিয়ার ৪টি - ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া। আফ্রিকার ৫টি - আইভরি কোস্ট, ঘানা, ক্যামেরুন, আলজেরিয়া ও নাইজেরিয়া। ১২ জুন শুরু, ফাইনাল হবে রিও ডি জেনেইরো-র মারাকানা স্টেডিয়ামে, ১৩ জুলাই।

কাদের দিকে নজর থাকবে?

মেসি, আগেরো, ইগুয়েন (আর্জেন্টিনা), রোনাল্ডো (পর্তুগাল), সুয়ারেজ (উরুগুয়ে), নেইমার, অস্কার (ব্রাজিল), জাভি, ইনিয়েস্তা, কোস্তা (স্পেন), ওজিল, মুলার, গোৎজে (জার্মানি), হ্যাজার্ড (বেলজিয়াম), রুনি (ইংল্যান্ড), রিবেরি, বেনজিমা (ফ্রান্স), রবেন, ভন পার্সি (হল্যান্ড), মডরিচ (ক্রোয়েশিয়া), দ্রোগবা, ইয়াইয়া টোরে (আইভরি কোস্ট), এটো (ক্যামেরুন)। কলম্বিয়ার রাদামেল ফালকাও যদি খেলতে পারেন, অবশ্যই নজর রাখতে হবে।

(লেখক প্রখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক)

বিশ্বকাপের ম্যাসকট

১৯৬৬ ১৯৭০ ১৯৭৪ ১৯৭৮ ১৯৮২ ১৯৮৬ ১৯৯০

১৯৯৪ ১৯৯৮ ২০০২ ২০০৬ ২০১০

১৯৬৬ ওয়ার্ল্ড কাপ উইলি (ইংল্যান্ড)
১৯৭০ হুয়ানিটো (মেক্সিকো)
১৯৭৪ টিপ অ্যান্ড ট্যাপ (পশ্চিম জার্মানি)
১৯৭৮ গাউচিটো (আর্জেন্টিনা)
১৯৮২ নারানজিটো (স্পেন)
১৯৮৬ পিকে (মেক্সিকো)
১৯৯০ চাও (ইতালি)
১৯৯৪ স্ট্রাইকার, দি ওয়ার্ল্ড কাপ পাপ (ইউএসএ)
১৯৯৮ ফুটিক্স (ফ্রান্স)
২০০২ আটো, কাজ ও নিক (কোরিয়া ও জাপান)
২০০৬ গোলিও (জার্মানি)
২০১০ জাকুমি (দক্ষিণ আফ্রিকা)

বিশ্বকাপের বল

ওজন ৪৩৭ গ্রাম। জল শোষণের মাত্রা ০.২ শতাংশ। পরিধি ৬৯ সেমি। সর্বাধিক লাফায় ১৪১ সেমি। বলটিতে রয়েছে ছ’টি পলিইউরেথেন প্যানেল, যা প্রচণ্ড বৃষ্টিতেও ওজন আর আকৃতি ঠিকঠাক রাখবে। বলের ভেতরে থাকা ব্লাডারটি এমনভাবেই তৈরি যে, কোনো অবস্থায় বলের আকৃতির পরিবর্তন ঘটবে না। বলের সেলাই আগের তুলনায় লম্বা অথচ গভীর হওয়ায় বাতাসে শটের গতিপথ হঠাৎ করে পরিবর্তিত হওয়ার প্রবণতা কমবে। একই কারণে বল নিখুঁত লক্ষ্যে আগের থেকে বেশি দুরত্ব যাবে। তিন রংয়ের বল হবে- ঝকঝকে সাদা, গাঢ় নীল এবং বিভিন্ন রংয়ের সংমিশ্রণ।

৭৩৭ নম্বরে ব্রাজুকা

মোট ৩২টি দেশ। প্রতি দলে ২৩ জন ফুটবলার, মোট ৭৩৬ জন। তা সত্ত্বেও বিশ্বকাপে সব সময় আরো একজন তারকা থাকে। চার বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে সেই ৭৩৭ নম্বর তারকাটির নাম ছিল ‘জাবুলানি’, ব্রাজিল বিশ্বকাপে ‘ব্রাজুকা’। ২০১৪ বিশ্বকাপ ফুটবলের সরকারি বল। বিশ্বকাপের জন্য অ্যাডিডাস-এর বারোতম নির্মিত বল। এখন দেখার ক্যাসিয়াস -বুঁফো-ন্যায়ারের মতো মহাতারকা গোলকিপার কিংবা মেসি-রোনাল্ডো-রুনি-নেইমারের মতো মহাতারকা স্ট্রাইকারদের মন কাড়তে পারে কি না ব্রাজুকা।।

ট্রফি না কফি!

অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের জন্য কফি সেন্টার থাকা আবশ্যক। শুধু তা-ই নয়, স্টেশনে বিশ্বের সব পত্রিকা থাকতে হবে। অবসর সময়ে না হয় কফির ভূমিকা জানা গেলো। কিন্তু বিশ্বকাপের সময় দুনিয়ার সব পত্রপত্রিকা পড়া জরুরি কেন? সাধারণত খেলার সময় সব দলই সংবাদমাধ্যম থেকে দূরে থাকতে চায়। উলটে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গেই থাকতে চাইছে অস্ট্রেলিয়া ফুটবল দল।

বল-বর্ধক কলা

প্রতিদিন প্রত্যেক ইউয়েডরের খেলোয়াড়ের ঘরে এক ঝুড়ি করে কলা দিতে হবে এবং মজার কথা সেই কলা আনতে হবে অবশ্যই ইকুয়েডর থেকে। ইকুয়েডরের কলা কি শক্তিবর্ধক? খেলে শক্তি বাড়ে? কে জানে, হতেও পারে। ভয়ও আছে, এত কলা দেখে শেষে দানি আলভেস না চটে যান।

বারে না, তরলে হ্যাঁ

বার সাবান একেবারেই বন্ধ। তরল সাবান রাখতে হবে। কারণ, ফ্রান্সে বার সোপের চল নেই। তাই মাঝপথে ফরাসি ফুটবলাররা যেন সমস্যায় না পড়ে তাই এই ব্যবস্থা। লিকুইড সাবান না পেলে তার প্রভাব পারফরম্যান্সে পড়বে কি না সময়ই বলবে।

সাও দাও

কলম্বিয়ার অনুশীলনে সাও পাওলো। ক্লাবের যুব দল থেকে ১৫ খেলোয়াড় দিতে হবে। এতে অবশ্য সাও পাওলো ক্লাবেরই লাভ। একটি জাতীয় দলের সঙ্গে ক্লাবের যুবদলের খেলোয়াড়দের মুফতে খেলার সুযোগ—মন্দ কী।

হন্ডু চ্যানেল

টিভি চ্যানেলগুলির তালিকায় অন্তত ছয়টি স্পানিশ চ্যানেল থাকতেই হবে। এর মধ্যে আবার দুটি হতে হবে হন্ডুরাসের চ্যানেল। দাবি হন্ডুরাস দলের। টিভি দেখতে গিয়ে কেউ না অনুশীলনে ফাঁকি দিয়ে বসেন।

স্নান জাপান

জাপান দলের ফুটবলাররা এতটাই শৌখিন যে তাদের প্রত্যেকের ঘরে একটি করে 'জাকুজি ব্র্যান্ডে'র বাথটাব দিতেই হবে। ভালো করে স্নান না করলে বোধহয় খেলার হেরফের হবে।

সাতের চার!

নিরাপত্তার জন্য সবসময় ছয়জন নিরাপত্তারক্ষী থাকতে হবে। এর মধ্যে চারজন দরকার শুধু ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর জন্য। সংখ্যাটা একটু কম হয়ে গেল না। সি আর সেভেনের ভক্তদের সামাল দিতে চারজনে হবে তো?

সাক্ষাৎ সুইস

'বিচ স্টুডিও' ছাড়াও প্রতি রুমে দুটি সুইস টিভি চ্যানেল থাকতে হবে। খেলতে না সাক্ষাৎকার দিতে যাচ্ছেন সুইস ফুটবলাররা?

ফুটবলের আপন দেশে
বিশ্বসেরার লড়াই

ফুটবলের আঁতুরঘরে বিশ্বকাপ, তাও আবার ৬৪ বছর পরে। কত না রঙ, কত না স্বপ্ন মেলবে ফুটবলের মাছরাঙা পাখি। ফুটবলের আপন দেশে কারা এগিয়ে, কারাই বা পিছিয়ে, কে দেখাবে চমক, কারাই বা এবার নতুন। সেই নিয়ে একটি মনোগ্রাহী প্রতিবেদন। লিখলেন মৈনাক দাশ।

আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরেই শুরু বিশ্ব ফুটবলের মেগা ইভেন্ট। বিশ্বকাপ। তাও আবার যে সে জায়গায় নয়, খোদ ফুটবলের আঁতুরঘর বলে পরিচিত যে দেশ, সেই ব্রাজিলের মাটিতে। যেখানকার সম্পর্কে কথিত আছে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা ফুটবল নিয়েই নাকি রাতে ঘুমোতে যায়। তো এমন একটা দেশে ফুটবলের সবচেয়ে বড়ো টুর্নামেন্ট। দেদার আলোচনা, আগ্রহ চারিদিকে। আর ১২ জুন যত এগিয়ে আসছে, ততই সব কিছু ছাপিয়ে বিশ্বকাপের কথা চলে আসছে সবার মুখে মুখে। সবকিছু ছাপিয়ে এখন শুধু মেসি, নেইমার, রোনাল্ডোরা কেমন খেলবেন বিশ্বকাপে, তাই নিয়ে চুলচেরা কাঁটাছেড়া চলছে সারা দুনিয়ায়।

আগামী ১২ জুন থেকে ১৩ জুলাই পর্যন্ত খেলা হতে চলা এই বিশ্বকাপ হতে চলেছে ইতিহাসের ২০তম ফুটবল বিশ্বকাপ। ১৯৫০ সালের পর এই প্রথম আবার ব্রাজিলের মাটিতে বসতে চলেছে বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর। অর্থাৎ এই নিয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে চলেছে লাতিন আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো দেশটি। পাঁচ বারের বিশ্বজয়ীদের দেশের মোট ১২টি শহরে ১২টি স্টেডিয়ামে খেলা হবে। খেলবে মোট ৫টি মহাদেশের মোট ৩২টি দেশ। চারটি করে দল রয়েছে আটটি গ্রুপে। এদের মধ্যে যেমন রয়েছে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, স্পেন, জার্মানি, নেদারল্যান্ডের মতো বিশ্ব ফুটবলের গোলিয়াথরা। আবার তেমনই হন্ডুরাস, চিলি বা গ্রিসের মতো ডেভিডরাও।

সবমিলিয়ে জমজমাট আসর! এতবড়ো টুর্নামেন্ট বলে তার জাঁকজমকই আলাদা। শুধু তাই নয়। বেশ কয়েক বছর ধরেই বিরাট কর্মকাণ্ড চলছে ব্রাজিলে। তাও আবার বিশ্বকাপের জন্যই। স্টেডিয়ামগুলো নতুন করে সাজানো থেকে শুরু করে নতুন নতুন রাস্তাঘাট তৈরি, সে এক বিরাট কাণ্ড বটে।

ব্রাজিলের রাস্তায় প্রতিবাদ, বিক্ষোভ।

তারচেয়েও বড়ো কথা, বিশ্বকাপের আগে ব্রাজিলের বিভিন্ন শহরে শুরু হয়ে গেছে অশান্তির বাতাবরণ। প্রাক্তনদের একটা অংশ ইতিমধ্যেই আওয়াজ তুলেছে, দ্রারিদ্র্যের মধ্যে এই বিশ্বকাপ আয়োজনে জন্য হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ! বেশ কয়েকবার বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে ব্রাজিল দলকে। স্বাভাবিক কারণেই, একটা চাপা অস্বস্তি রয়েছে গোটা ব্রাজিল জুড়েই।

ব্রাজিলের যে স্টেডিয়ামগুলোতে খেলা হবে তারমধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো মারকানা স্টেডিয়াম। ব্রাজিলের অন্যতম নামী তো বটেই সবচেয়ে বড়ো স্টেডিয়ামও এই মারকানা। রিও ডি জেনেইরোতে অবস্থিত এই স্টেডিয়ামের পুরো নাম 'এস্তাদিও দো মারকানা'। প্রায় ৭৭,০০০ দর্শক এখানে একসঙ্গে বসে খেলা দেখতে পারেন। আর বিশ্বকাপে খেলা হতে চলা স্টেডিয়ামগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোটো হলো 'এরিনা দাস দুনাস'। ব্রাজিলের নাটাল শহরে অবস্থিত এই স্টেডিয়ামে একসঙ্গে বসে খেলা দেখতে পারেন প্রায় ৪২,০০০ দর্শক। বিশ্বকাপের কথা ভেবেই তৈরি করা হয়েছে এই স্টেডিয়ামটি।

আগামী বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে সাওপাওলোর 'এরিনা দে সাওপাওলো'তে খেলতে নামবে আয়োজক দেশ ব্রাজিল এবং ক্রোয়েশিয়া। ৩২টি দেশের মধ্যে থেকে মোট ১৬টি দেশ যাবে নক্‌আউট পর্বে। সেখানে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে কঠিন লড়াইয়ের পর কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমি-ফাইনাল পেরিয়ে ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ১৩ জুলাই। তাও আবার মারকানা স্টেডিয়ামে যে মাঠে ১৯৫০ সালে ফাইনালে উঠেও খেতাব পায়নি ব্রাজিল। উরুগুয়ের কাছে ফাইনালে ম্যাচে ১-২ গোলে হার মেনেছিল। এবার সেই দগদগে স্মৃতি মোছার পালা।

বিশ্বকাপ মানেই থাকবে বিশ্বকাপের ম্যাসকটও। দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে ছিল 'জাকুমি'। তেমনি এবার রয়েছে 'ফুলেকো'। ব্রাজিলের আমাজন অরণ্যে

(এরপর ৬ পাতায়)

কাপ দখলের লড়াইতে সবসময়ই ব্রাজিল ফেভারিটের তালিকায়। দেখে নেওয়া যাক কেমন অবস্থা এবারের ব্রাজিল দলের।

অ্যাডভান্টেজ : ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ হওয়ায় জনসমর্থন। কোচ লুই ফেলিপে স্কোলারি এবং টিডি কার্লোস আলবার্তো পাহিরার ফুটবল বুদ্ধি। গত বছর কনফেডারেশনস' কাপ দিয়েছে এই জুটি। থিয়াগো সিলভা, দানি আলভেজ, পওলিনহো, অস্কার, নেইমাররা নিজেদের দিনে যে কোনো প্রতিপক্ষর কাছেই ত্রাস। গত কনফেডারেশনস' কাপে ব্রাজিলের ১৪ গোলের মধ্যে ৯ টাই করেছিলেন এই নেইমার ও ফ্রেড। **তাহলে সমস্যা কোথায় :** প্রি-কোয়ার্টার বা কোয়ার্টারে মুখোমুখি হতে পারে নেদারল্যান্ডস বা স্পেন। স্কোলারির টিমে কেউ কিন্তু অতীতে বিশ্বকাপ চাম্পিয়ন হয়নি। শেষ দু' বছরে মাত্র পাঁচটা প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ। তাও গত বছর কনফেডারেশনস' কাপে। **চমক :** দলে নেপোলির ডিফেন্ডার হেনরিকের অর্ন্তভুক্তি। অনেকেই এই জায়গাতেই দেখতে চেয়েছিলেন আটলেটিকো মাদ্রিদের মিরান্দাকে। **অতীতের পারফরম্যান্স:** এখনো পর্যন্ত সবকটি (১৯টা) বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে চ্যাম্পিয়ন পাঁচবার। (১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭০, ১৯৯৪, ২০০২), রানার্স- ১৯৫০, ১৯৯৮। **অবস্থান :** গ্রুপ 'এ'। গ্রুপে রয়েছে ক্রোয়েশিয়া (১২ জুন), মেক্সিকো (১৭ জুন), ক্যামেরুন (২৩ জুন)।

স্কোলারির নেতৃত্বে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নেইমারের এই ব্রাজিল অন্য সমস্ত দলকে পিছনে ফেলে ফের চ্যাম্পিয়ন হতে পারে। ব্রাজিল অবশ্যই বিশ্বকাপের অন্যতম দাবিদার।

বিজ্ঞানের খবর

দ্বীপ নিয়েই চিন্তা

অপরাজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

'রেইজ ইওর ভয়েস, নট দ্য সি লেভেল। গলায় আওয়াজ তুলুন, সমুদ্রের জলতল নয়। এবছর এমনই বার্তা নিয়ে এলো ৪২তম বিশ্ব পরিবেশ দিবস। আমরা সবাই জানি ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। বছরে অন্তত একটা গিন গোটা বিশ্বের মানুষকে পরিবেশ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার সুযোগ এনে দেয় এই দিনটি। রাষ্ট্রসংঘ তাই বরাবরই গুরুত্ব দিয়ে আসছে এই দিনটিকে উদ্‌যাপনের। ২০১৪ সালে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের ভাবনায় সমুদ্র জলতলের প্রসঙ্গটা বেশি করে এসেছে।

রাষ্ট্রসংঘের তরফে এবছরকে 'ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ স্মল আইল্যান্ড অ্যান্ড ডেভেলপিং স্টেটস্' আগেই ঘোষণা করেছে। মহাসাগরের ওপরে ভেসে থাকা দ্বীপ এখন পরিবেশবিদদের বেশি করে ভাবাচ্ছে। কারণ জলে ভেসে থাকা দ্বীপের অস্তিত্বটা টিকে থাকার একমাত্র শর্ত সমুদ্র জলের উচ্চতা বৃদ্ধি না পাওয়া। সমুদ্রপৃষ্ঠের জলের তল বাড়লেই বিপদ। নোনা জল ডুবিয়ে দেবে দ্বীপকে। সেখানে বাসকারী মানুষরা শুধু নয়, তা হলে বিপন্ন হবে দ্বীপকে আঁকড়ে বেঁচে থাকা বিস্তর জীবজগত। এক একটি দ্বীপ জৈববৈচিত্রে

বিজ্ঞানীদের কাছে পরম বিস্ময়ের। বিজ্ঞানের ভাষায় জীবজগতের 'হট স্পট'। জৈবপ্রকৃতির অফুরাণ সম্পদ রয়েছে সেখানে। কোন একটি ছোট্টো দ্বীপ সমুদ্র গর্ভে চলে যাওয়ার অর্থ জীবজগতের অপূরণ ক্ষতি। সমুদ্রের সঙ্গে ভূপ্রকৃতির মেলবন্ধন ঘটাতে দারুণ ভূমিকা নেয় ছোটো, মাঝারি ও বড়ো দ্বীপ। ভারত, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়াসহ গোটা বিশ্বেই কমবেশি ছড়িয়ে আছে রকমারি দ্বীপ। মানুষ সেসব দ্বীপে থাকুক আর নাই থাকুক, ঐ দ্বীপ প্রাকৃতিকভাবে মহাসাগরের নিয়ন্তা। তাই পৃথিবীর তিন ভাগ জলের এক ভাগ স্থলে থাকা মানুষকে শুধু ডাঙ্গা নিয়েই ভাবলে চলবে না। চাই জলে আশ্রয় করে বেঁচে থাকা ভাসমান ভূখণ্ড নিয়ে নতুন নুতন ভাবনা।

তবে যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন হয়েছে তার অনেকটা আজ অধরা। ২০০৯ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত পরিবেশ সম্মেলনে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের নানান দিক ও তার প্রতিকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ১৯৯৭ সালে জাপানের কিওটো সম্মেলনের পর ইদানীংকালে কোপেনহেগেনের পরিবেশ সম্মেলন দারুণ গুরুত্ব পেয়েছিলো। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। রাষ্ট্রপ্রধানদের ঐ আলোচনাচক্রে অনেক প্রস্তাব এলেও হাতে গোনা উন্নত দেশের অনীহার জন্য বাস্তবায়নের লক্ষ্য পূরণ হয়নি। তবুও ক্ষয়িষ্ণু পরিবেশকে বাঁচাতে ফি বছর ৫ জুন পালিত হয়ে আসছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। তাই বিশ্ব নাগরিকের কাছে ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে সংক্ষেপে 'ওয়েড' দারুণ আশা নিয়ে আসে।

শুরুর উদ্দেশ্যটাও তাই ছিলো। বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক কর্মোদ্যোগ আর জনসচেতনতার মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যেই রাষ্ট্রসংঘ ৫ জুনের দিনটি পালনের উদ্যোগ নিয়েছিলো। ১৯৭২ সালের ৫ জুন থেকে ১৬ জুন অবধি রাষ্ট্রসংঘের প্রথম সম্মেলনে এই প্রস্তাবনাটি আসে। পরের বছর ১৯৭৩ সাল থেকে পরিবেশ দিবস পালন শুরু হয়। প্রতি বছর দিবসটি আলাদা আলাদা শহরে, আলাদা আলাদা প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে পালিত হয়ে আসছে। আন্তর্জাতিক গবেষণা বলছে, আগামী ৫০ বছরে ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলের অধিকাংশ জেলা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই সারা দেশের প্রায় ১০ শতাংশ মানুষ পরিবেশজনিত কারণে উদ্বাস্তু হয়ে পড়বেন।

এই খবরটা নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য বিপজ্জনক। যেহারে আন্টার্টিকার বরফ গলতে শুরু করেছে তাতে আশঙ্কার বাইরে থাকছে না ভারতের মতো অন্যদেশ। গত শতকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ০.৭ ডিগ্রি বেড়েছিলো। চলতি শতকে গড় তাপমান বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসকে ছাড়িয়ে গেছে। তাই অস্বাভাবিক মেরু বরফের গলনের কথা নিয়ে বলে গেলেই হবে না। তা রুখতে ব্যবস্থা নিতে হবে আমাদেরকে। বিশ্বের মোট নিঃসারিত কার্বনের ০.৩ শতাংশের জন্য দায়ী ভারত। তাহলে প্রশ্ন আসে এতো কম কার্বন নিঃসরণ করেও এই দেশের উপর এমন বিপর্যয় নেমে আসবে কেন? কারণ শিল্পায়ন থেমে নেই। আমাদের প্রতিবেশী দেশ চিনসহ অনেক উন্নত দেশ তালিকার শীর্ষে রয়েছে। এর কারণ হলো তাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়ন। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে চলমান এই বিপর্যয়ের ধারা অব্যাহত।

শুধু তাই নয়, বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলো তাদের শিল্প কারখানার পাশাপাশি কার্বন নিঃসরণের পরিমাণও বাড়িয়ে চলেছে। এই বিপর্যয় রোধের জন্য ১৯৭২ সালে শুরু হয় বিশ্বরক্ষার আন্দোলন। আর ১৯৯২ সালে এরই ধারাবাহিকতায় অনুষ্ঠিত হয় 'বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন'। কিন্তু এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত আজও হয়নি। আর তা হয়নি উন্নত দেশগুলির অনীহার কারণে। তারা তাদের কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমাতে রাজি নয়। কারণ এতে তাদের উন্নয়নের অব্যাহত ধারায় বিঘ্ন ঘটবে। তাদের এই আত্মঘাতী কর্মকাণ্ডের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ভারত, বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের দেশের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া সিডার কিংবা আইলা তারই প্রমাণ। আর এই অপরিকল্পিত শিল্পোন্নয়ন যে আত্মঘাতী তা প্রমাণিত হয়েছে গত কয়েক বছরে।

আমেরিকার উপর দিয়ে প্রবাহমান প্রাকৃতিক দুর্যোগ, চির শীতল রাশিয়ায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে পৌঁছানো কিংবা জাপানে এবং ভারত উপসাগরে পর পর দুটি সিডার তার প্রমাণ। সব মিলিয়ে আমরা বলতে পারি সারা বিশ্বের প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারাচ্ছে এবং প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় মানুষের জীবন টালমাটাল হয়ে পড়ছে। একে অনেকে প্রাকৃতিক প্রতিহিংসাও বলছে। তবে মানুষের দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজের পরিণতিতেই পরিবেশের এই অবনতি তা বলার মানুষ থাকছে না। বিজ্ঞানীরা বারেবারে দেখিয়েছেন অপরিকল্পিত শিল্পোন্নয়নের জন্য পরিবেশ-প্রকৃতি আজ বিরূপ আচরণ শুরু করেছে। পৃথিবীর ৬৫০ কোটির উপর আবাস, প্রাত্যহিক চাহিদা মিটিয়ে আসা প্রকৃতির এই পরিবর্তন নিয়ে চিন্তাতো বাড়বেই।

(এরপর ৬ পাতায়)

মগজাস্ত্রে পরিবেশ

শুরু হল ক্যুইজ। অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা এবং কচিকাঁচারা আমাদের দপ্তরে চিঠি লিখে ক্যুইজ চালু করবার বিষয়ে আমাদের অনুরোধ জানিয়েছিল। তাদের অনুরোধে আমাদের নতুন বিভাগ **মগজাস্ত্র**। তোমাদের জন্য কলম ধরেছেন **ড. মৌসম মজুমদার**। এবারের বিষয়: **বিশ্ব পরিবেশ দিবস**।

১) বিশ্ব পরিবেশ দিবস কবে পালিত হয়?
২) ভারতের কোন শহরের দূষণের পরিমাণ সামগ্রিকভাবে কম?
৩) পৃথিবীর কোন দেশ সবথেকে বেশি কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে?
৪) পৃথিবীর সবচেয়ে কম দূষণ কোন দেশে?
৫) গঙ্গা আমাদের দেশের দীর্ঘতম নদী। দূষণের হাত থেকে গঙ্গাকে বাঁচাতে GAP গ্রহণ করা হয়েছে। এই GAP-র অর্থ কী?
৬) WWF একটি সংস্থা যারা বন্যপ্রাণি সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। WWF-এর পুরো কথা কী?
৭) WWF কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
৮) WWF-এর প্রতীকে কোন লুপ্তপ্রায় প্রাণির ছবি ব্যবহার করা হয়?

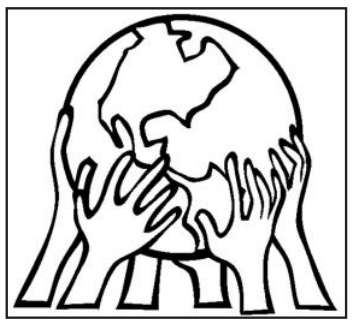

৯) ভারতবর্ষের প্রাচীনতম পরিবেশ আন্দোলন কোনটি?
১০) চিপকো আন্দোলনের সঙ্গে আর কোন ব্যক্তির নাম জুড়ে রয়েছে?
১১) নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের সঙ্গে কোন ব্যক্তির নাম জড়িয়ে আছে?
১২) বিশ্ব উষ্ণায়ন তথা গ্রিন হাউস এফেক্টের জন্য অন্যতম দায়ী গ্যাস CFC। এর পুরো নাম কী?
১৩) বিশ্বের উষ্ণায়নের জন্য বিশেষ করে দায়ি কার্বন, নাইট্রোজেন ও সালফারের বিভিন্ন অক্সাইড এবং মিথেন প্রভৃতি গ্যাস। এগুলিকে একত্রে কী বলা হয়?
১৪) 'রেড বুক ডাটা' কী?
১৫) অল্প বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন পদ্ধতি গৃহীত হচ্ছে। অল্প বৃষ্টি সৃষ্টির জন্য দায়ী কোন দুটি গ্যাস?
১৬) মাথাপিছু সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে কোন দেশ বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে?
১৭) ভারতের দুটি বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নাম কী?
১৮) জল দূষণে সৃষ্ট 'মিনামাটা' রোগের সঙ্গে কোন দেশের নাম জড়িত?
১৯) ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো পরিবেশ দূষণ সৃষ্টিকারী ঘটনা। এখানে দায়ী কোন গ্যাস?
২০) বিপন্ন প্রজাতির প্রাণি সংরক্ষণের জন্য জাতীয় উদ্যান গড়ে তোলা হয়। পশ্চিম বাংলার একটি জাতীয় উদ্যানের নাম বলো যেখানে বাঘ সংরক্ষণ করা হয়?

উত্তর :

১। প্রতি বছর ৫ জুন। ১৯৭৩ সাল থেকে পালন করা হচ্ছে। ২। বেঙ্গালুরু (কর্ণাটক)। ৩। চিন। ৪। আইসল্যান্ড। ৫। গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান। ৬। World Wild Fund for Nature। ৭। ১৯৬১ সালে। ৮। জায়েন্ট পান্ডা। ৯। রাজস্থানের বিশনয়ী আন্দোলন। ১০। সুন্দরলাল বহুগুণা। ১১। মেধা পাটেকর। ১২। ক্লোরোফ্লুরোকার্বন। ১৩। ফ্রিয়ন গ্যাস। ১৪। ডব্লুডব্লুএফ প্রকাশিত যে বইতে লুপ্তপ্রায় বিপন্ন প্রাণিদের নামের তালিকা রয়েছে সেই বইটিকে 'রেড বুক ডাটা' বলা হয়। ১৫। সালফার ডাই অক্সাইড এবং নাইট্রোজেনের গ্যাসীয় অক্সাইড। ১৬। আফ্রিকা মহাদেশের কেনিয়া। ১৭। গুজরাতের লাম্বা, তামিলনাড়ুর সুপান্ডল। ১৮। জাপান। ১৯। মিক-মিথাইল আইসোসায়ানেট। ২০। বক্সা।

ফুটবলের মহারণ

(১ পাতার পর)

আমরা যারা বাংলার ফুটবলপ্রেমী তারা বিভিন্ন সময়ে ক্লাব ফুটবলের খেলাগুলোতে কোনো না কোনো ক্লাবের সমর্থক হই। খেলা দেখতে দেখতে নিজেদের অজান্তেই রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সিলোনা, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, বায়ার্ন মিউনিখ - এই ধরনের কিছু প্রথম সারির দলের সমর্থক হয়ে উঠেছি। এই আমরাই এক সময় ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান নিয়ে পাগলামি করতাম, তেমন হয়তো এখন করি না ঠিকই কিন্তু একটা সমর্থন আমরা সবসময়ই দিয়ে থাকি। আমরা দেখেছি, স্কুলে বা পাড়ার ফুটবল ক্লাবে অথবা টেলিফোনেই বিদেশি ক্লাবগুলোর খেলা নিয়ে তর্কে বিতর্কে মেতে উঠি। কিন্তু কেন এই সমর্থন? লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো, নির্দিষ্ট কয়েকজন খেলোয়াড়ের হাত ধরেই আমাদের ক্লাব ফুটবলের সমর্থন ঘোরাফেরা করে। রিয়াল মাদ্রিদের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, বেনজিমা, ডিমারিয়া—এদের অনবদ্য গোল বা 'ড্রিবলিং' আমাদের অবাক করে। এদের হাত ধরেই আমরা রিয়াল মাদ্রিদের সমর্থক। মেসি, নেইমার, ইনিয়েস্তার খেলায় মুগ্ধ হয়ে আমরা বার্সিলোনার সমর্থক হয়েছি। অন্যদিকে ডেভিড বেকহ্যাম, ওয়েন রুনি, ম্যানপার্সি আমাদের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সমর্থক করেছে। অনেকে লিভারপুলকেই সমর্থন করছেন। আসলে ব্যক্তিগত নৈপুন্য আমাদের

মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। সেখান থেকেই আমরা কোনো না কোনো ক্লাব দলের সমর্থক হয়েছি।

এবার কিন্তু ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ শেষ। চার বছর পর ঘটতে চলেছে Greatest show on Earth। একসময় অলিম্পিককে এই খেতাব দেওয়া হয়েছিল। অলিম্পিকের অন্যতম আকর্ষণ ছিল অ্যাথলেটিক্স-The queen of sports। অলিম্পিকে রঙবেরঙের পোশাক পরে আমাদের সামনে হাজির হতেন অংশগ্রহণকারীরা। রঙিন এই উৎসব তাই Greatest show on Earth হিসেবে স্বীকৃত। আমার মনে হয়, এখন ফুটবল সেই খেতাবটা ছিনিয়ে নিয়েছে। ২০৪টি দেশ অংশগ্রহণ করে গোটা বিশ্ব জুড়ে। আসলে আগামী ১২ জুন থেকে বিশ্বকাপ শুরু হলেও আদতে তা শুরু হয়ে গিয়েছিল ২০১১ সাল থেকেই। গত তিন বছর ধরে ছ'টি মহাদেশে মূল পর্বে খেলার জন্য বিভিন্ন যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন দেশ। মোট ৩২টি দেশ (আয়োজক ব্রাজিলসহ) মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

যে দেশগুলি মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে সেইসব দেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে রয়েছে আমাদের সমর্থিত ক্লাব ফুটবলের বিভিন্ন খেলোয়াড়রা। আর্জেন্টিনার মেসি, পর্তুগালের রোনাল্ডো, ব্রাজিলের নেইমার এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম আকর্ষণ। এদের জন্যই আমরা কেউ ব্রাজিলকে বা কেউ আর্জেন্টিনাকে সমর্থন করি।

ব্রাজিলের ছন্দময় ফুটবল আমাদের আকর্ষণ করে। ফিলিপ ল্যাম্ব বা মুলার আমাদেরকে জার্মানির সমর্থক হতে উদ্বুদ্ধ করে। আবার জার্মানির জার্সিতে লাল-হলুদ রঙ থাকায় অনেক ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক একটা অন্যরকম টানে জার্মানিকে সমর্থন করে। জিদানের কথা মনে করে ফ্রান্সকে; রবার্তো বাজ্জিও, মালদিনি বা দেল পিয়েরোর জন্য ইতালিকে সমর্থন করে বেশ কিছু মানুষ। মারাদোনা, বুরুচাগার জন্য আমরা আর্জেন্টিনাকে আগে যেমন সমর্থন করেছি ঠিক তেমনই এবছর মেসি, ডিমারিয়াদের জন্য আর্জেন্টিনা এখনও হট ফেভারিট। গত কয়েক বছর আমাদের বাঙালি সমর্থকেরা আর্জেন্টিনা-ব্রাজিলে বিভক্ত ছিল। এবছর সেই ভাগে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো থাবা বসিয়েছে। রোনাল্ডোর জন্যই অনেকে পর্তুগালের সমর্থক।

কখনো 'ড্রিবল', কখনো 'ডিফেন্স চেরা থ্রু পাস' আবার কখনো বাঁ পায়ের তীব্র শট্ – লিওনেল মেসির মধ্যে মারাদোনাকে আমরা দেখতে পাই। আমি বলতে পারি, ১৯৮৬-র বিশ্বকাপ যেমন ছিল মারাদোনার তেমন ২০১৪-র বিশ্বকাপ মেসির হলে অবাক হওয়ার মতো কিছু নেই। পর্তুগালের অধিনায়ক ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর অপ্রতিরোধ্য গতি ও স্কিল সবসময়ই বিপক্ষের কাছে ত্রাসের কারণ। দেশের হয়ে ১১০ ম্যাচে ৪৯ গোল করা 'সি আর ৭' গত বিশ্বকাপে অফ ফর্মে থাকলেও এবছর আবার আমাদের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। মাত্র ১৯ বছর বয়সে দক্ষিণ আমেরিকার সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি যার মুকুটে সেই নেইমার ব্রাজিল দলের যেমন নির্ভরযোগ্য ফরোয়ার্ড তেমনই গেমমেকারও বটে। তার ওপরেই অনেকটা নির্ভরশীল ব্রাজিল। রোনাল্ডিনহো-রোনাল্ডো-রবার্তো কার্লোস-রিভাল্ডোদের মতো তারকা খেলোয়াড় দীর্ঘদিন ব্রাজিলিয়ান ফুটবলে আমরা পাইনি। সেই অবস্থায় কনফেডারেশনস' কাপে প্রায় একাই ব্রাজিলকে চ্যাম্পিয়ন করে নেইমার দীর্ঘদিন পরে আবার ব্রাজিল সমর্থকদের মনে আশা জাগিয়েছে।

খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত নৈপুন্যের আালোচনায় না গিয়ে বলাই যায় আমরা টেনশনমুক্ত হয়েও টেনশনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিশ্বকাপ দেখতে বসব। অনেকে বলেন, এশিয়া মহাদেশের কোনো টিমকে কেন সমর্থন নয়? এক্ষেত্রে বলা যায়, বিশ্বকাপে ভারত নেই, দেশই নেই তাহলে আবার মহাদেশ কী? আমরা সেই দলেরই সমর্থক যে দলে অসাধারণ কিছু ফুটবলার রয়েছে, যারা ক্লাব ফুটবলেও আমাদের রাত জাগাচ্ছে, মা-বাবার কাছে বকুনি খাওয়াচ্ছে।

আমার মনে হয় অনেক পড়ুয়ারা আমার সঙ্গে একমত হবে যে গ্রীষ্মের ছুটি বা শীতের ছুটি বিশ্বকাপের বছরে কমিয়ে দিয়ে বিশ্বকাপের সময় স্কুল ছুটি দিলে বেশি আনন্দ পাওয়া যায়। প্রতি বছর কেন বিশ্বকাপ হয় না এটা আমার একসময়ের প্রশ্ন ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'রবিবার' কবিতাটি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য-রোজ রোজ কেন রবিবার হয় না? ঠিক তেমনই প্রতি বছর কেন বিশ্বকাপ হয় না, কেন চার বছরের অপেক্ষা!

(লেখক প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার, 'খেলা' পত্রিকার সম্পাদক)

দ্বীপ নিয়েই চিন্তা

(পাঁচ পাতার পর)

সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন, কিছু রাষ্ট্রের বাড়তি মুনাফার জন্য প্রকৃতির স্বাভাবিক চলমান ধারা থেকে সরিয়ে অপরিকল্পিত শিল্পোন্নয়ন ঘটিয়ে চলছে। অনাহারের হাত থেকে মুক্তির অজুহাতে সে কাজ সুকৌশলে করা হচ্ছে। ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা হিসাব কষে দেখিয়েছেন, উন্নতির লক্ষ্যে বাড়ছে খাদ্যের দাম। আগামী ২০ বছরে খাদ্যের দাম দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। বর্তমানে বিশ্বের মানুষ যে ভালো অবস্থায় নেই তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ এখনো বিশ্বের প্রায় ১০০ কোটি মানুষ তিন বেলা খেতে পায় না। তাহলে আমাদের সামনে একটি প্রশ্ন চলেই আসে - কোন দিকে চলেছে আমাদের বিশ্ব পরিস্থিতি? শুধুই কি সমর্থ দেশের ধনী নাগরিকরা আরামে থাকবে আর বাকিরা প্রতি মুহূর্তে অনাহার-মহামারীতে ভুগে চলবে? সেটাতো হতে পারে না। চারিদিকে হাজারো হতাশার মধ্যেও সম্ভাবনা একেবারে যে নেই তা নয়। সম্প্রতি জার্মানি ঘোষণা দিয়েছে তারা ২০২২ সালের মধ্যে সব পারমাণবিক চুল্লি বন্ধ করে দেবে। জার্মানির মতো অনেক দেশই বিকল্প জ্বালানি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে। বায়ু শক্তি, সৌর শক্তি কিংবা জৈবগ্যাসের ওপর কমবেশি সব দেশই জোর দিচ্ছে। ওদিকে, নাইরোবি, নাইজেরিয়াসহ আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ প্রাকৃতিক বিপর্যয় রুখতে লক্ষ লক্ষ হেক্টর জুড়ে গাছ লাগিয়ে চলছে। পৃথিবীর স্বাদু জলের প্রায় অর্ধেকই ভারত দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। কেন্দ্রে সদ্য আসা সরকারও গঙ্গার দূষণ কমাতে উদ্যোগী। তাই আশার প্রদীপ এখনো নিভে যায়নি। পরিবেশ নিয়ে যেকোনো স্থিতিশীল প্রকল্প করতে গেলে ভুললে হবে না সেই পুরোনো শ্লোগানকে-থিঙ্ক গ্লোবালি, অ্যাক্ট লোকালি! বিশ্বজনীন ভাবনা করলেও কাজটা করতে হবে এলাকা ভিত্তিক। এটাই পরিবেশ রক্ষার মূল মন্ত্র।

(লেখক বিজ্ঞান বিষয়ক সাংবাদিক)

বিশ্বসেরার লড়াই

(৪ পাতার পর)

পাওয়া যায় আর্মাদিলো নামে একরকমের প্রাণি। সেই প্রাণিই আসলে এবার ব্রাজিল বিশ্বকাপের ম্যাসকট।

লাতিন ভাষায় 'ফুতেবল' (ফুটবল) এবং 'ইকোলজিয়া' (ইকোলজি), এই শব্দকে মিলিয়ে তৈরি হয়েছে ম্যাসকটের নাম 'ফুলেকো'।

বিশ্বকাপ মানেই এক ঝাঁক তারকা ফুটবলারের নতুন করে উঠে আসা। আবার বিশ্বকাপ মানেই অনেক তারকার ফুটবল থেকে বিদায় নেওয়াও। এই তো। মিরোস্লাভ ক্লোসেকে মনে আছে তো? জার্মানির সেই দুরন্ত স্ট্রাইকার, যিনি গোল করেই ভল্ট দিয়ে নজর কেড়ে নিয়েছিলেন ২০০২ বিশ্বকাপে। সেই ক্লোসে তো এবারেই খেলতে চলেছেন তাঁর চতুর্থ বিশ্বকাপ। এবং শেষ বিশ্বকাপও। হন্ডুরাস যেমন এবার প্রথম দলগঠন করে সাড়া ফেলে দিয়েছে, তেমন এবারই প্রথম খেলছে বসনিয়া ও হার্জিগোভিনিয়া।

খোদ ব্রাজিলের কথাই ধরা যাক। সেদেশের বিশ্ব জয়ী কোচ লুই ফিলিপ স্কোলারি এবার দলে রাখেননি কাকা, রোবিনহোর মতো মহাতারকাদের। নয়া দল গড়েছেন, যে দলের অভিজ্ঞতা তেমন জোরালো নয়। কিন্তু ইউরোপে খেলার মুন্সিয়ানা রয়েছে। নেইমারকে নিয়ে ব্রাজিল সমর্থকদের আশা অনেক। কিন্তু এই বিশ্বকাপের মঞ্চে অনভিজ্ঞ সেই ফুটবলাররা বড়ো মঞ্চে কিছু করতে পারবেন কিনা বা করলেও কতটা কী করবেন, সেটাই বড়ো প্রশ্ন। তবে পুরনো মুখদের দেখা যেমন যাবে না, তেমনই আবার নতুন মুখদেরও তো দেখা যাবে। কে বলতে পারে, ব্রাজিলের মাটিতেই উত্থান ঘটবে না নয়া কোনো তারকার? মেসি, রোনাল্ডোদের মতোই নতুন কোনো দুনিয়া কাঁপানো তারকার উঠে আসা দেখা যেতেই পারে এবারের বিশ্বকাপে।

(লেখক ক্রীড়া সাংবাদিক)

কার্লসেন : মোৎসার্ট অফ চেস্

চেস দাদু

শুরু হয়েছে ধারাবাহিক দাবা চর্চা। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে দাবা চর্চায় মন দিলে পড়াশোনার উন্নতি হয়, জানাচ্ছেন গবেষকরা। তবে শুধু কাগজে-কলমে বা বোর্ডে দাবা চর্চাই নয়, ভালো দাবাড়ু হতে গেলে দরকার শারীরিক ও মানসিক শক্তি। **চেস্ দাদু** তোমাদের সামনে যেমন বিভিন্ন বিশ্বখ্যাত দাবাড়ুদের কথা তুলে ধরবেন তেমনি থাকবে রাজ্যের ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত দাবা প্রতিযোগিতার ফলাফল। এই সংখ্যার আকর্ষণ অল বেঙ্গল এজ্ গ্রুপ চেস্ চাম্পিয়নশিপ ২০১৪-এর ফলাফল।

একটা বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন দাবা খেলা ও লেখাপড়ার সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করেছেন। তার গবেষণার প্রক্রিয়াতে তিনি দু'দল ছাত্র নেন। এদের মধ্যে একদল দাবা খেলা জানে ও নিয়মিত খেলে। আর একদল দাবা জানে না বা খেলে না। দেখা গেল পরীক্ষার ফলাফল যারা দাবা জানে তাদের অনেকটাই ভাল হচ্ছে যারা খেলে না তাদের তুলনায়। এই বিদেশি গবেষক এই বিষয় নিয়ে পি.এইচ.ডি. অর্জন করেছেন। বলে রাখি গবেষক নিজেও একজন গ্র্যান্ডমাস্টার। গ্র্যান্ডমাস্টার উপাধি দেওয়া হয় আন্তর্জাতিক দাবা ফেডারেশনের পক্ষ থেকে। বলাবাহুল্য গ্র্যান্ডমাস্টার কথার অর্থ যিনি দাবা খেলায় যথেষ্ট পটুত্ব অর্জন করেছেন। ভারতে প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার হলেন বিশ্বনাথন আনন্দ, পরে যিনি কয়েকবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এখন অবশ্য ভারতে বেশ কয়েকজন গ্র্যান্ডমাস্টার আছেন। যদিও আনন্দের সমতুল্য কেউ নেই।

এবার তোমাদের বর্তমান দাবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ম্যাগন্যাস কার্লসেন সম্পর্কে কিছু বলি। কার্লসেন ১৯৯০ সালের ৩০ নভেম্বর নরওয়ের টনসবার্গ-এ জন্মগ্রহণ করেন। দাবা প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে শুরু করেন যখন তাঁর বয়স আট। অতএব খেলা শেখা হয়ে গেছে তারও অনেক আগে। ২০০৩ সালে কার্লসেন ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার খেতাব লাভ করেন। বলে রাখি, এই ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার খেতাবটি গ্র্যান্ডমাস্টার থেকে অনেক নীচের একটি খেতাব। ভারতে এমন অনেক ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার আছে। এরপর কার্লসেন এত ভালো খেলা শুরু করলেন যে ওয়াশিংটন পোস্ট তাঁকে 'মোৎসার্ট অফ চেস্' খেতাবে ভূষিত করে। ২০০৪-এ কার্লসেন গ্র্যান্ডমাস্টার খেতাব অর্জন করেন। ওঁর আরো কীর্তি এবং বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার কথা অন্য কোনো লেখায় পরে বলব।

ছোট্টো বন্ধুরা এবার তোমাদের কথায় আসি। একটা দাবা বোর্ড নিশ্চয় কিনে ফেলেছো। ৬৪ ঘরের বোর্ডটি সাদা ঘর ডানদিকে রেখে বসিয়ে ফেলো। বাবা, মা বা অন্য কাউকে নিয়ে খেলা শুরু করে দিতে পারো। খেলা শেখার একটা বই অবশ্য তোমাদের দরকার। এ ব্যাপারে একটা ইংরেজি বই সুসা কোলগার লিখেছেন। হাঙ্গেরির এই মহিলার অনেকগুলি বই আছে। তোমরা প্রাথমিক পাঠের বই থেকে দাবা খেলা শুরু করে দিতে পারো। আর তোমাদের চেস্ দাদুতো তোমাদের সঙ্গে আছেই।

এবার তোমাদের দাবা প্রতিযোগিতার কথা বলি। 'অল ইন্ডিয়া চেস্ ফেডারেশন' নামে একটি সংস্থা আছে। এরা আবার বিশ্ব দাবা ফেডারেশনের স্বীকৃত। আবার এই 'অল ইন্ডিয়া চেস্ ফেডারেশন' বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্য দাবা প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। আমাদের রাজ্যে 'বেঙ্গল চেস্ অ্যাসোসিয়েশন' আছে। এদের অনুমোদিত অনেক প্রতিযোগিতা বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। এমন একটি প্রতিযোগিতা হয়ে গেল ১৭-১৮ মে ২০১৪ কলকাতার পদ্মপুকুর অঞ্চলে। ডা. কুশল চৌধুরী ও তাপস সরকারের সুযোগ্য ব্যবস্থাপনায় 'অল বেঙ্গল এজ্ গ্রুপ চেস্ চাম্পিয়নশিপ ২০১৪' অনুষ্ঠিত হল এই পদ্মপুকুরে। অন্যান্য খেলায় যেমন রেফারি থাকে, দাবা খেলা পরিচালনা করেন Arbita। এই প্রতিযোগিতায় নানা বয়সের ছেলেমেয়েদের বিভাগ ছিল এবং Chief Arbita ছিলেন সুনীত চট্টোপাধ্যায়। ২৬৭ জন প্রতিযোগীকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা হয়। যেমন, অনূর্ধ-১৬, অনূর্ধ-১৩, অনূর্ধ-১১, অনূর্ধ-৯, অনূর্ধ-৭। বুঝতেই পারছো বয়স অনুসারে এই ভাগ। এবার তোমাদের খেলার ফলাফল নিয়ে জানাচ্ছি।

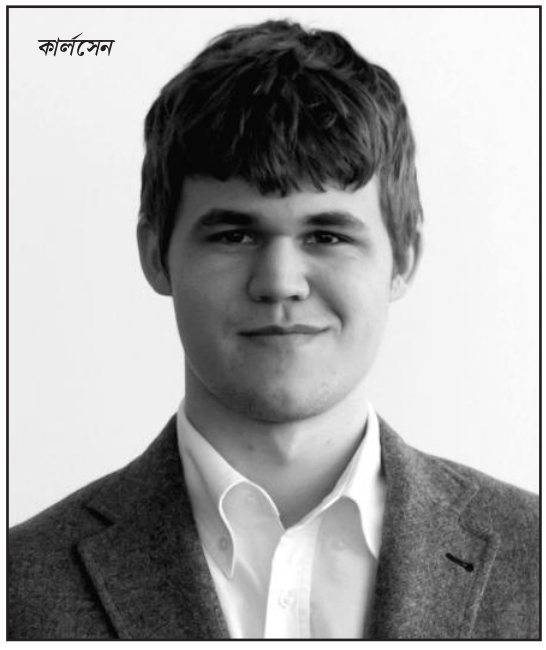

ছেলেদের অনূর্ধ ৭ - প্রথম : **ঋত্বিক চক্রবর্তী** (সম্ভাব্য ৭ পয়েন্টের মধ্যে ৬ পয়েন্ট পেয়েছে। বুঝতেই পারছো বেশ ভালো খেলেছে।) দ্বিতীয় : **সৌহার্দ বসাক** (৭-এ ৫)। তৃতীয় : **দেবাদৃত বন্দ্যোপাধ্যায়** (৭-এ ৫)।

মেয়েদের অনূর্ধ ৭ - প্রথম : **তানিশা চট্টোপাধ্যায়** (৭-এ ৬)। দ্বিতীয় : **কঙ্গনা সিন্হা** (৭-এ ৬)। তৃতীয় : **সিন্থিয়া সরকার** (৭-এ ৫)।

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রথম দু'জন বেশ ভালো খেলেছে। তোমরা তাড়াতাড়ি খেলা শিখে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারো।

ছেলেদের অনূর্ধ ৯ - প্রথম : **দেবার্ঘ সামন্ত**। দ্বিতীয় : **রৌদ্রিক সাহা তালুকদার**। তৃতীয় : **সন্দীপন পাল**।

মেয়েদের অনূর্ধ ৯ - প্রথম : **যশজ্যোতি বীর**। দ্বিতীয় : **আয়ুষী চট্টোপাধ্যায়**। তৃতীয় : **আরাধনা গঙ্গোপাধ্যায়**।

ছেলেদের অনূর্ধ ১১ - প্রথম : **সৌম্য চক্রবর্তী**। দ্বিতীয় : **আদিত্য বসু**। তৃতীয় : **সংকেত চক্রবর্তী**।

মেয়েদের অনূর্ধ ১১ - প্রথম : **দিয়া চৌধুরী**। দ্বিতীয় : **মেহেন্দি শীল**। তৃতীয় : **মৌমিতা দে**।

ছেলেদের অনূর্ধ ১৩ - প্রথম : **রৌণক পাঠক**। দ্বিতীয় : **তমাল রায়চৌধুরী**।

মেয়েদের অনূর্ধ ১৩ - প্রথম : **অর্পিতা মুখোপাধ্যায়**। দ্বিতীয় : **অস্মিতা দাস**। তৃতীয় : **সমৃদ্ধা ঘোষ**।

ছেলেদের অনূর্ধ ১৬ - প্রথম : **সপ্তর্ষি গুপ্ত**। দ্বিতীয় : **অনুষ্টুপ বিশ্বাস**। তৃতীয় : **সৌমিক কর**।

মেয়েদের অনূর্ধ ১৬ - প্রথম : **চান্দ্রেয়ী হাজরা**। দ্বিতীয় : **অঙ্গীরা চৌধুরী**। তৃতীয় : **মেঘা মণ্ডল**।

এবার জানাই ২জুন থেকে ৬ জুন রুবি পার্কের দিল্লী পাবলিক স্কুল-এ বসছে অল বেঙ্গল সাব-জুনিয়র চেস্ চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। যারা ইচ্ছুক খেলতে বা খেলা দেখতে তারা ইচ্ছে করলে বেঙ্গল চেস্ অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিতে পারো।

একেবারে শেষে অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল 'বি' চেস্-এর খবর দিচ্ছি। অনেক গ্র্যান্ডমাস্টার, ইন্টারন্যাশনাল মাস্টারদের নিয়ে এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন গুজরাতের বিজিত সন্তোষ। তিনি একজন গ্র্যান্ডমাস্টারও বটে। যদিও এই প্রতিযোগিতায় বাংলার ফলাফল মোটেই ভালো নয়। ২৮তম স্থানে আছে সায়ন্তন দাস। তবে একজন বাঙালি ভালো খেলেছেন এবং চতুর্থ স্থানও লাভ করেছে। সে হল গ্র্যান্ডমাস্টার দীপ সেনগুপ্ত। যদিও সে বাংলার হয়ে নয় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার হয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। তোমরা খেলতে থাকো চেস্ দাদু তোমাদের সঙ্গে আছে ও থাকবে।

আতঙ্ক নয়, অঙ্ক

গত সংখ্যায় আমরা মৌলিক সংখ্যা নিয়ে কিছু আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু ১, ২, ৩, ৫, ৭ ইত্যাদির মতো ছোটোখাটো মৌলিক সংখ্যা নিয়ে খুব একটা মাথাব্যথা না থাকলেও বড়ো বড়ো মৌলিক সংখ্যা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে গবেষণা, তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই। গণিতজ্ঞরা অবশ্য মৌলিক সংখ্যা নির্ণয়ের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এরমধ্যে আধুনিক সংখ্যাতত্ত্বের জনক ফার্মাট এবং ফরাসি গণিতজ্ঞ মার্টিন মর্সিনির সূত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার, ফার্মাটের সূত্রটি ১৬৪০ সালের এবং মার্সিনির সূত্রটি ১৬৪৪ সালের।

ফার্মাটের সূত্র অনুযায়ী মৌলিক সংখ্যা ($2^{2n}+1$)। এখানে n=০, ১, ২, ৩ ইত্যাদি। এই সূত্রের সাহায্যে যে সমস্ত সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে ফার্মাট সংখ্যা বলা হয়। উল্লেখ্য, এই সূত্রের সাহায্যে প্রাপ্ত প্রথম ৫টি সংখ্যা মৌলিক হলেও, পরবর্তী ৪টি সংখ্যা মৌলিক নয়।

অন্যদিকে মর্সিনির সূত্র অনুযায়ী প্রাপ্ত মৌলিক সংখ্যাকে মর্সিনি সংখ্যা বলা হয়। মর্সিনির সূত্র অনুসারে মৌলিক সংখ্যা ২^{P} -১। এখানে P= (১,২, ৩,৫,৭,১৩,১৭,১৯,৩১,৬৭, ১২৭ ...)। কিন্তু অঙ্ক কষে দেখা গেল P=৬৭-এর ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সংখ্যাটি মৌলিক নয়। অনেকের মতে এটি ছাপার ভুল। ৬৭-এর বদলে ৬১ হবে, তাহলে প্রাপ্ত সংখ্যাটি মৌলিক হবে। পরবর্তীকালে গবেষণায় P'র আরো মান আবিষ্কৃত হয়েছে, যেমন ৫২১, ৬০৭, ১২৭৯, ২২০৩, ২২৮১, ৩২১৭, ৪২৫৩, ৪৪২৩, ৯৬৮৯, ৯৯৪১, ১১২১৩, ১৯৯৩৭।

পরবর্তী সংখ্যায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাসন রামানুজনের নামাঙ্কিত রামানুজন সংখ্যার মজার মজার বিষয়ে বলব। এই সংখ্যাকে পরবর্তী কালে ট্যাক্সিক্যাব (Taxicab) সংখ্যা নামে অভিহিত করা হয়।

আধুনিক সংখ্যাতত্ত্বের জনক ফার্মাট

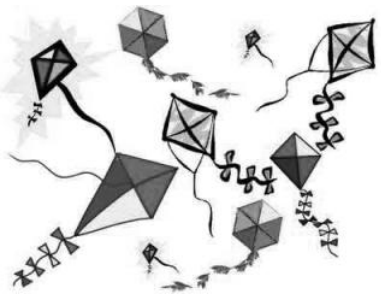

তা ধিন্ ধিন্ মনটা আমার

সোহেল রানা বীর

ইচ্ছে করে ঘুড়ির মতো
আকাশ পানে উড়তে
ইচ্ছে করে দস্যি হয়ে
মাঠে মাঠে ঘুরতে।

ইচ্ছে করে পাখির মতো
ডানা দু'খান মেলতে
ইচ্ছে করে সঙ্গী নিয়ে
কানামাছি খেলতে।

ইচ্ছে করে দিন দুপুরে
বৃষ্টি হয়ে ঝরতে
ইচ্ছে করে দাদুর সাথে
দুষ্টুমিটা করতে।

ইচ্ছে করে সব সময়ে
গোল্লাছুট খেলতে,
ইচ্ছে করে সঙ্গীবিহীন
একলা পথে চলতে।

ইচ্ছে করে হরেক রকম
ইচ্ছে ঘুড়ি সাজতে,
ইচ্ছে করে রাখাল ছেলের
বাঁশি হয়ে বাজতে।

ইচ্ছে করে হতে আমার
নদীর পানি, ঢেউ,
রাজকুমারীর দেশে যাবো -
সঙ্গে যাবে কেউ?

তা ধিন্ ধিন্ মনটা আমার

সোহেল রানা বীর

পাখির মতো দুইটি ডানা আমার যদি থাকতো,
শিল্পী যদি মনের মতো আমার ছবি আঁকতো -
ভর দুপুরে মায়ের বকা বন্ধ যদি রাখতো,
সারা বছরে আমগাছের ঐ আমগুলো সব পাকতো -
কী যে মজা হতো,
খুশি অবিরত -
তা ধিন্ ধিন্ মনটা আমার সকাল দুপুর নাচতো!

পরীর দেশের জোছনা পরী আমায় যদি ডাকতো,
চু, কিৎ কিৎ গোল্লাছুটে আমায় নিয়ে মাখতো -
লেখাপড়া সারাজীবন বন্ধ যদি থাকতো,
পাতার মতন মনটা আমার থিরথিরিয়ে কাঁপতো -
কী যে মজা হতো,
সব যে মনের মতো -
আমার যত ইচ্ছেগুলো ইচ্ছেমতো বাঁচতো,
তা ধিন্ ধিন্ মনটা আমার সকাল দুপুর নাচতো!

আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ থেকে সোহেল রানা বীর কিচির মিচিরের জন্য দুটি ছড়া পাঠিয়েছেন।

ছন্দে আনন্দে

আঁকার ফ্যাসাদ

দেবাশিস্ বসু

বাগিয়ে তুলি খাতার পাতায়
যেই এঁকেছি মেঘ
অমনি ঝেঁপে বৃষ্টি এলো
মন জুড়ে উদ্‌বেগ্।
ঠিক আছে ভাই আঁকবো না মেঘ
আঁকছি এবার ভোর
ভোর বললে সূয্যি কোথায়
কোথায় রঙের ঘোর?
ভোর মুছে তাই নতুন সকাল
আলতো তুলি দাগ
আমি একাই আঁকবো আকাশ
করবে কি কেউ রাগ?
আকাশ জুড়ে রঙের খেলায়
আঁকছি গোলাপ-জুঁই
মা রেগে ক'ন, ওঠরে খোকা
কত ঘুমাস তুই!

আঁকিবুকি

দেবাশিস্ বসু

খোকাবাবু আঁকিয়ে
আঁকে ছবি জাঁকিয়ে
যেমন তেমন নয়
কাজ বড়ো সূক্ষ্ম ...
টেবিলটা ভরা তার
সাপ-ব্যাঙ-গন্ডার
মানুষটা পারে নাকো
এই তার দুঃখ!

মিঁয়াও মিঁয়াও ডাক
ছোট্টো পুষির নাক
দিচ্ছে টুকি দুষ্টু খুকি
এবার খাতায় আঁক!
খুকির তাতেই রাগ
আঁকছে বিকট বাঘ
বুঝলে হে-হে তাইতো দেহে
অমন ডোরা দাগ!

দুটি ছেলে

হারাধন সাহা

একটা ছেলে ওড়ায় ঘুড়ি
কখনো বা লাট্টু,
আরেক ছেলের সঙ্গী ঘরে
কাঠের ঘোড়া টাট্টু।

একটা ছেলে বাঁশি বাজায়
উদোম মাঠে দেয় ছুট
আরেক ছেলের নেটেতে চোখ
সামনে দেখে অর্কুট।

একটা ছেলে সাঁতার কাটে
নদীর জলে তোলে ধুম,
অন্য ছেলের সোফায় মাথা
দু' চোখেতে অঘোর ঘুম।

একটা ছেলে আলগা গায়ে
নিজেকে সে বাদশা ভাবে,
অন্য ছেলে স্যুটে বুটেই
শীতের সকাল দূর হটাবে!

একটা ছেলের গল্পে আসে
আকাশ, বাতাস, নর-নারী,
অন্য ছেলের গল্পে শুধু
কার্টুন আর বইয়ের স্টোরি।

একটা ছেলে স্বপ্ন দেখে
তেপান্তর আর পক্ষী-ঘোড়া
অন্য ছেলের দু'চোখেতে
স্বপ্ন শুধু রোবট জোড়া।

একটা ছেলে উদাস বাউল
পশু-পাখিই সাথি,
অন্য ছেলের বন্দী জীবন
সকাল, দুপুর, রাতি।

একটা ছেলে হাওয়ার নাচন
শালপিয়ালের সারি,
অন্য ছেলের একাকীত্বে
মনটা লাগে ভারী।

এমনি করেই দিন চলে যায়
মাসের পরে বছর
কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক
জানেন জাদুকর।

ধারাবাহিক উপন্যাস

বুমবুম আর ঈগল রাজার মুকুট

বিবেক কুণ্ডু

(আগে যা ঘটেছে - বুডো আর জুডো নামের দুই কালো চিতাবাঘকে গুহার বাইরে পাহারায় রেখে গোপন মিটিং করতে গুহার ভেতরে ঢোকে খটাখট। বলে যায় গুহার আশেপাশে অন্য কাউকে দেখলেই তার ঘাড় মটকে দিতে। বুডোর সঙ্গে ছিল বৈজ্ঞানিক পানিনির তৈরি এক দুর্দান্ত যন্তর, যেটা কানে লাগিয়ে গুহার ভেতরের সব কথা শুনে ফেলে জুডো। ও জানতে পারে যে ওই মিটিংয়ে খটাখট ছাড়াও রয়েছে দিগগজ, কুটকুট আর অজানা কেউ যাকে বাকি তিনজন মহারাজ বলে ডাকে। সে চায় আবছাই নদীর ওপাড়ের সুন্দর দেশ সবুজপাহাড়ের ঈগল রাজাকে সরিয়ে নিজে সেখানকার রাজা হতে। খটাখট আর বাকিদের সে বলে যে রাজা হবার জন্য তার চাই ঈগল রাজার মুকুট। তারপর মিটিং শেষ হয়ে যায়। আর খটাখট বেরিয়ে আসবার আগেই বুডো সবকিছু শুনতে চায় জুডোর কাছে ফিসফিসিয়ে - যাতে আর কেউ সেই গোপন কথা শুনতে না পায়।)

জুডো ফিসফিস করে যা যা শুনেছে সব বলল। শুনে তো বুডো অবাক! কে এই মহারাজ যে সবুজপাহাড়ের রাজা হতে চায়? আর সে ঈগল রাজার মুকুট নেবেই বা কেমন করে? এই প্রশ্নগুলো ঘুরপাক খেতে লাগল ওর মাথায়।

জুডো আর বুডো দেখতে পেল না, ওদের মাথার উপরে যে গাছটা রয়েছে তার এক উঁচু ডাল থেকে ঝুলছে এক বাদুড়। নাম তার ফুড়ুত। বাদুড় এমনিতেই অনেক দূরের শব্দ শুনতে পায়, তাই একটু কান খাড়া করতেই জুডো আর বুডোর সব কথা শুনে ফেলল ফুড়ুত। তারপর মোবাইল ফোনের মতো একটা যন্তর বের করে চটপট বোতাম টিপে পাঠাল একটা গুপ্ত সংকেত। সঙ্গে সঙ্গে নিচে গুহার পেছনে লুকিয়ে থাকা গিরগিটির কানে পৌঁছে গেল একটা 'টিকটিক' শব্দ।

গিরগিটি কানে হাত চাপা দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ফুড়ুত, কী শুনলে বলে ফেল। ওরা খুব আস্তে বলছিল, আমি শুনতে পাইনি।'

কথা বলতে বলতেই ফুড়ুত উপর থেকে দেখতে পেল গুহা থেকে বেরিয়ে এল বিশাল শকুন খটাখট। বেরিয়ে জুডো আর বুডোর সঙ্গে কথা বলে ওদের একটু বকাবকি করল, তারপর ওদের পিঠে চেপে চলে গেল জঙ্গলের দিকে।

আরেকটু পর হেলতে দুলতে গুহা থেকে বেরল প্যাঁচাদের রাজা দিগগজ আর তার পেছন পেছন দুষ্টু হায়েনা কুটকুট। প্যাঁচা নিজেই উড়ে চলে গেল (প্যাঁচা নিশাচর পাখি তো, রাতে খুব ভালো দেখতে পায়) ওর দুর্গের দিকে। হায়েনা এগোল ছোট্টো খালটার দিকে। যা পেটুক, হয়তো কিছু খাবার মতলব আছে।

গিরগিটিকে সব কথা বলবার পর ফুড়ুত উল্টো হয়ে ঝুলে থেকেই নজর রাখতে লাগল নিচের গুহাটার দিকে। ভাবল, কিছুক্ষণ পর যদি গুহার ভেতরের সেই দুষ্টু রাজাকে দেখতে পাওয়া যায়।

আর গিরগিটি একটু দেরি না করে দিল ছুট। ওকে এখন যেতে হবে বুড়ো মৌমাছির কাছে। গোপন খবরটাকে সংকেত বানিয়ে পাঠাতে হবে অনেকদূর, সেই আবছাই নদীর ওপাড়ে

- সবুজ পাহাড়ে - ঈগল রাজার দেশে।

।।১।।

মাত্র পাঁচদিন হল বুমবুম সাইকেল চালাতে শিখেছে। কিন্তু এর মধ্যেই ও রেস-রেস খেলা শুরু করে দিয়েছে ডিংগোর সঙ্গে।

(ডিংগো বুমবুমের বন্ধু, মস্ত বড় অ্যালসেশিয়ান, বুমবুমের সঙ্গেই থাকে। ডিংগোকে খুব ভালবাসে বুমবুম। বুমবুমের আগের অ্যাডভেঞ্চার 'বুমবুম আর দুষ্টু জাদুকর' পড়লে তোমরা ওর কথা আরও জানতে পারবে। নয়ন এর দেওয়া জাদুর গুণে ডিংগো মানুষের মত কথা বলতে পারে, তবে শুধু বুমবুম এর সঙ্গেই।)

সাইকেল কেনার চারদিন পরেই বাবা সাইকেল-এর দু'পাশের ব্যালেন্স চাকা দুটো খুলে দিয়ে বললেন, 'এগুলো খুলে দিলাম, নইলে সাইকেল শেখা হবে না। আস্তে আস্তে চেষ্টা করো, ঠিক ব্যালেন্স এসে যাবে। না পারলে আমাকে বোলো, আমি ধরব।'

ব্যাস, এবার তো ভারী মুশকিলে পড়ল বুমবুম, এই কদিন ওই ব্যালেন্স চাকাদুটো থাকায় সাইকেল নিয়ে এদিক ওদিক যাওয়া গেছে। এখন দুটো পা মাটি থেকে তুলতে গেলেই সাইকেল একদিকে হেলে যাচ্ছে - এই বুঝি পড়ে ধপাস করে!

রোজ রাস্তায় বেরিয়ে পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে সাইকেল চালাতে হচ্ছে কিন্তু ব্যালেন্স না থাকায় উপায় নেই। ঘোষদের বাড়ির হোঁৎকা ছেলেটো একতলায় বারান্দা থেকে ওকে দেখে হেসে হেসে বলে, "বুমবুম, কচ্ছপ নাকি তোর পাশ দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে যায়, সত্যি রে? আগে তো বেশ খরগোশ ছিলি, এখন কি হল?"

বুমবুমের খুব রাগ হয় কিন্তু ও কিছু বলে না। হাসিমুখে ছেলেটোর দিকে তাকায় আর সাইকেল ঠেলে পা দিয়ে। ওর খুব ইচ্ছে নিজে নিজেই সাইকেলটা শিখে বাবা, মা, দিদিকে চমকে দেয়। তাই বাবাকে ধরতে বলে না।

ডিংগো দুদিন বুমবুমের সাইকেল চড়া দেখল, তারপর বুঝে গেল ওকেই কিছু একটা করতে হবে। নইলে এভাবেই আরো দশ দিন কেটে যাবে।

এমনিতে বুমবুম সাইকেল নিয়ে বেরোলে ডিংগো ওর পাশে পাশে হাঁটে। তিনদিনের দিন বুমবুম সাইকেল নিয়ে বেরোতেই ডিংগো জোরসে দিল ছুট।

ওর কাণ্ড দেখে চেঁচিয়ে উঠল বুমবুম - "দাঁড়া ডিংগো, আস্তে আস্তে চল, দৌড়চ্ছিস কেন?"

ডিংগো একটু দূরে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। বুমবুমের দিকে তাকিয়ে মাথাটা ঘোরালো এদিক ওদিক। তারপর সামনের একটা পা তুলে নাড়াল বারকয়েক। যার মানে, "আমি আর দৌড়চ্ছিনা। এবার তুমি এদিকে চলে এস দেখি।"

"খুব দুষ্টু হয়েছিস, মজা দেখাচ্ছি"- এই কথাটা মনে মনে ভেবে ডিংগোকে ধরবার জন্য সাইকেল থেকে নামতে গিয়ে বুমবুম বুঝতে পারল ওর সাইকেলটা কেউ পেছন থেকে টেনে ধরেছে। পেছন ফিরে দেখবার আগেই একটা গলা শুনল বুমবুম, "পেছনে না দেখে প্যাডেলে পা দাও সোজা তাকিয়ে সাইকেলটা চালাও বুমবুম। ভয় নেই, তুমি পড়বে না।"

বুমবুম অবাক হল বটে তবে আর পেছন ঘুরে দেখল না। সামনে তাকাতেই দেখতে পেল পার্ক-এর পাশের বিরাট বটগাছটা। ওর মনে পড়ে গেল মহাভারতে অর্জুন কেমন করে শুধু একটা মাছের চোখের দিকে তাকিয়ে তীর ছুড়েছিলেন। বুমবুম মনে মনে ভাবল একটু অর্জুনের মত করে চেষ্টা করা যাক। আর পেছনে তো কেউ একজন ধরেই আছে। পড়ে যাবার ভয় নেই। আর দেরি না করে সোজা বটগাছটার দিকে তাকাল বুমবুম, তারপর ডান প্যাডেলে পা রেখে পেছনের লোকটাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি ধরে আছ তো, চালাই তাহলে?"

পেছনের গলাটা ফিসফিসিয়ে বলল - "আছি বাবা আছি। চালাও দেখি এবার।"

কী আশ্চর্য, ডান প্যাডেলে চাপ দিতেই সাইকেলটা এগিয়ে গেল সামনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বাঁ প্যাডেলেও চাপ দিল বুমবুম। সাইকেল আরো এগোলো, একটুও হেলে গেল না। ভারি মজা হল বুমবুমের। সোজা বটগাছের দিকে তাকিয়ে ডান -বাঁ-ডান-বাঁ-ডান-বাঁ এভাবে বারকয়েক প্যাডেলে চাপাচাপি করতে করতেই বুমবুম দেখল যে ও ডিংগোর প্রায় সামনে এসে পড়েছে। সাইকেল কিন্তু হেলে যায়নি একবারও।

"ইয়াহু"- চেঁচিয়ে উঠল বুমবুম -"সাইকেল শিখে গিয়েছি আমি।"

ডিংগো লাফিয়ে উঠে বলল, "শাবাশ বুমবুম, ব্রেক চাপো এবার।"

ব্রেক করতে গিয়েই বুমবুমের মনে পড়ল পেছনের লোকটার কথা। ব্রেক চেপে এক পা মাটিতে রেখে পেছনে তাকাল বুমবুম। অবাক কাণ্ড, পেছনে কেউ নেই।

"আরে লোকটা গেল কোথায়?" - বলে উঠল বুমবুম।

ডিংগো ততক্ষণে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

"কোন লোক?" ডিংগো জানতে চাইল।

"যেই লোকটা আমার সাইকেলটা পেছন থেকে ধরে ছিল এতক্ষণ। তুই দেখিসনি?"

'লোক! তোমার মাথায় কি পোকা ঢুকেছে? তুমি তো নিজে নিজেই সাইকেলটা চালিয়ে এলে। কেউ তোমার সাইকেলের পেছনে ছিল না।" - অবাক হয়ে বলল ডিংগো।

আজব ব্যাপার! লোকটা ভ্যানিশ হয়ে গেল? ব্যাপারটা বেশ ম্যাজিকের মত হল। সে যাই হোক, অর্জুনের বুদ্ধিটা দারুন কাজে দিয়েছে - এটা ভেবে খুব আনন্দ হল বুমবুমের। ও আবার প্যাডেলে পা দিল। আর ডিংগোকে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ। তুই বুদ্ধি করে না দৌড়ালে সাইকেল শিখতেই পারতাম না।"

ডিংগো বলল, "ওয়েলকাম, ওয়েলকাম। এবার আমি আস্তে আস্তে দৌড়চ্ছি, তুমি পাশে পাশে চালাও।"

শুনে বুমবুম খুব খুশি। এবার আবার সামনে তাকাল ও। বটগাছটা এখন আরো কাছে চলে এসেছে। বটগাছটার দিকে তাকিয়ে ডান প্যাডেলে চাপ দিতে সাইকেল এগিয়ে গেল, তারপর বাঁ প্যাডেলে চাপ দিতে সাইকেল এগিয়ে গেল, তারপর বাঁ প্যাডেলে চাপ দিতে দিতেই বুমবুমের মনে হল ও যেন আকাশে উড়ছে। সাইকেল এগিয়ে চলল, সঙ্গে সঙ্গে চলল বুমবুমের প্যাডেলিং। এক মুহূর্তের জন্য আনন্দে চোখ দুটো বুজে গেছিল ওর। পরের মুহূর্তেই বুমবুমের কানে এল ডিংগোর চিৎকার, "কোথায় যাচ্ছ বুমবুম? দেখে চালাও।"

চোখ খুলতেই বুমবুম দেখল ও বটগাছের রাস্তা ছেড়ে বাঁকাপথে বাড়ির দিকে চলছে আর ওর সাইকেলের দিকেই হেঁটে হেঁটে আসছে ঘোষদের বাড়ির সেই হোঁৎকা ছেলেটো!

এই রে! মহা মুস্কিল হল তো! বুমবুম একটু ভয় পেয়ে গেল এবার। ডিংগো এদিকে দৌড়তে দৌড়তে চেঁচাচ্ছে, "সাইকেলটা ঘোরাও বুমবুম, আরেকটু এদিকে ঘোরাও।"

বুমবুমের সাইকেলের হ্যান্ডেলটা ঘোরাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সাইকেলটাকে যেন ভুতে পেয়েছে। সাইকেলটা আরো বেশি করে এগিয়ে যেতে লাগলো ওই ছেলেটার দিকেই।

(আবার পরের সংখ্যায়)

শুরু হয়েছে খেলা নিয়ে আকর্ষণীয় এক কলম। একটু অন্যরকম। হবেই। শুধু মনে নয়, মননেও দাগ কাটবে। খেলা মানে, শুধু খেলাই নয়, খেলার আগে, পিছে বা সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মজাটাকে তুলে ধরাই এই কলমের মূল লক্ষ্য। - **কিচির মিচির**

অবাক খেলা

অলক চট্টোপাধ্যায়

খেলাধুলোয় লড়াই আছে, থাকবেও। কিন্তু হিংসুটেপনার কোনো সুযোগ নেই। কেউ কেউ 'কিচির মিচির'-র প্রথম সংখ্যায় এই ধারাবাহিক লেখায় শুধুই ফুটবলের উল্লেখ থাকার জন্য মৃদু অভিযোগ করেছেন। সবিনয়ে জানাই কোনো বিশেষ ভাবনায় ফুটবলকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। কিন্তু কথা যখন উঠেছে, তখন এবার থেকে শুধুই ফুটবল নয়, নানা ধরনের খেলার উল্লেখ এই পাতায় থাকবে। এবং ছোটো-বড়ো ঘটনাগুলোর একটা শিরোনামও দেওয়া হবে।

ডাবল হ্যাট্‌ট্রিক-এর অধিনায়ক

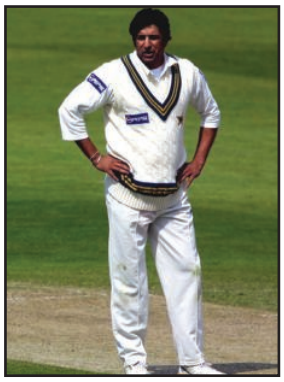

টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে একজনই অধিনায়ক আছেন যিনি টেস্টে দুবার হ্যাট্‌ট্রিক করেছেন। তিনি পাকিস্তানের বাঁ-হাতি অলরাউন্ডার ওয়াসিম আক্রাম। ১৯৯৮-৯৯ সালে এশিয়ান টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ খেলায় আক্রাম শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে হ্যাট্‌ট্রিক করেন। তাঁর শিকার ছিলেন কালুবিথারনা, বন্দরাতিলকে এবং বিক্রমসিংঘে। ম্যাচটা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ওয়াসিম আক্রামকে সেই ম্যাচে 'ম্যান অফ্ দি ম্যাচ'-এর পুরস্কার দেওয়া হয়নি। আটদিন পরে দুটি দলের মধ্যে আবার খেলা শুরু হলে আক্রাম হ্যাট্‌ট্রিক করেন। এবার তাঁর শিকার ছিলেন গুণবর্ধনে, চামিন্ডা ভাস এবং জয়বর্ধনে।

মিস্টি সাফল্য

বার্সিলোনার পৃথিবী বিখ্যাত ক্লাবটি স্থাপন করেছিলেন চিনি ব্যবসায়ী হ্যান্‌স ক্যাসপার (Hans Casper)। নিজের কাকার সঙ্গে সেখানে বেড়াতে এসে জায়গাটা তাঁর এত ভালো লেগে যায় যে তিনি শহরটাতেই বসবাসের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। শুধু তা-ই নয়, নিজের নামটাও বদলে নতুন নাম রাখেন জোয়ান (Joan)। ১৮৯৮-তে তিনিই ফুটবল ক্লাবটা প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গে ব্রিটিশ ও সুইৎজারল্যান্ড-এর প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও ক্লাবটিতে ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন।

শ্রদ্ধায়

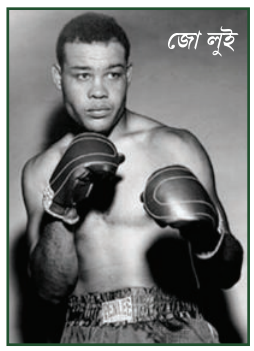

শ্রদ্ধা ও ভালবাসার আসল ঠিকানা মানুষের মন। উপযুক্ত সময়ে সেই শ্রদ্ধা ভাষায় প্রকাশিত হয়। ১৯৮১-তে মুষ্টিযোদ্ধা জো লুই (Joe Louis) মারা যাওয়ার পর মহম্মদ আলি যে ভাষায় নিজের শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে - ''জো লুই ছিলেন আমার অনুপ্রেরণা। আমি তাঁকেই আমার আদর্শ করেছিলাম। আমি শুধু বলার জন্যই নিজেকে 'গ্রেটেস্ট' বলতাম। তিনিই ছিলেন আসল 'গ্রেটেস্ট'।''

ভাগ্যের কালো বিড়াল

পৃথিবীর অন্য সব খেলার মতো ফুটবলেও অজস্র কুসংস্কার আছে। মাঠে জেতা-হারা সবই ঘটে দলের খেলোয়াড়দের দক্ষতায়। কিন্তু কুসংস্কার যায় না। ইংল্যান্ডের একটা ফুটবল ক্লাবের কর্মকর্তাদের বিশ্বাস ভাগ্যের সাহায্য দরকার। ২০০৯ সালের কোকাকোলা চ্যাম্পিয়নশিপ-এর একটা ম্যাচে প্রেস্টান নর্থ এন্ড (Preston North End) ক্লাবটা ব্রাইটন-এ অনুষ্ঠিত ম্যাচটা কেন ৩-০ গোলে জিতেছিল? কারণ একটা ছুটন্ত কালো বিড়াল তার মাঠে হাজির হয়েছিল সেই জন্যে।

চিরস্মরণীয়া

কৃতিত্বের প্রশ্নে তিনি সত্যিই চিরস্মরণীয়া। অস্ট্রেলিয়ার মহিলা সাঁতারু ডন ফ্রেজার (Dwan Frasor) প্রথম ও একমাত্র মহিলা সাঁতারু যিনি পরপর তিনবার অলিম্পিকে ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল সাঁতারে স্বর্ণপদক জিতেছিলেন। তাঁর এই স্বর্ণজয়ের বছরগুলো ছিল ১৯৫৬ (মেলবোর্ন), ১৯৬০ (রোম) এবং ১৯৬৪ (টোকিও)।

সত্যি?

সকলের সব কথা লোকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু বিশ্বাস না করলে কিছুই করার থাকে না। কোর্টের মধ্যে মেজাজ হারিয়ে মাঝে মাঝেই আম্পায়ারদের সঙ্গে ঝগড়া করতেন আমেরিকার টেনিস-তারকা জন ম্যাকেনরো। ১৯৮১-তে তাঁকে এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে ম্যাকেনরো সবিনয়ে বলেছিলেন 'Really, I'm very shy and quiet.'

কাপ দখলের লড়াইতে সবসময়ই অন্যতম সেরা আর্জেন্টিনা। দেখে নেওয়া যাক কেমন অবস্থা এবারের আর্জেন্টিনা দলের।

অ্যাডভান্টেজ : আলেহান্দ্রো সাবেয়ার আক্রমনের সঙ্গে রক্ষণের মিশেলে তৈরি ট্যাকটিস। মেসির উপস্থিতি। বলার অপেক্ষা রাখে না নিজের দিনে মেসি অপ্রতিরোধ্য। জাবালেতা, মাসচেরানোর 'কোবরা ট্যাকল'। মাঝমাঠে ডিমারিয়ার নেতৃত্বে আক্রমণ পরিচালনা। অ্যাকটিং থার্ডে মেসি-আগেরো-ইগুয়েন ত্রিফলা আক্রমণ। তাহলে সমস্যা কোথায় : রক্ষণে থাকা ফেডেরিকো, ইজেকুয়ালরা সেভাবে পরীক্ষিত নন। আগেরো, ইগুয়াইনরা মাঝে মাঝেই অফ-ফর্মে চলে যান। ডিমারিয়ার চোট। সবথেকে বড়ো কথা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলে খেলা বলে মানসিক চাপও একটা ফ্যাক্টর। সঙ্গে একসঙ্গে ক্লাব ফুটবলে খেলায় দু'পক্ষই একে অপরের দূর্বলতা জানে। চমক : ডেমিশেলিস-এর অর্ন্তভুক্তি। ২০১১-র পর থেকে জাতীয় দলে খেলেননি। চার মাস আগেও বিশ্বকাপ দলে ঠাঁই পাওয়া নিয়ে ছিল বড় প্রশ্ন। এছাড়াও ইন্টারমিলানের অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার রিকার্ডো আলভারেজ। অতীতের পারফরম্যান্স : এখনও পর্যন্ত ১৫ বার অংশ নিয়ে চ্যাম্পিয়ন দু' বার। ১৯৭৮ এবং ১৯৮৬। অবস্থান : গ্রুপ 'এফ'। বসনিয়া—হার্জিগোভিনা (১৫ জুন), -ইরান (২১ জুন), নাইজেরিয়া (২৫ জুন)।

অনেকেই বলছেন ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপ যেমন ছিল মারাদোনার তেমনই ২০১৪ সালের বিশ্বকাপ হতে চলেছে লিওনেল মেসির।

যাদের দিকে মূল নজর

স্লোগান

বিশ্ব ফুটবলের মহাযুদ্ধে প্রতিবছরই থাকে একটা স্লোগান। এই স্লোগান তৈরির সময় ফুটবলের আন্তর্জাতিকতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ২০১৪ ব্রাজিল বিশ্বকাপের স্লোগান 'অল ইন ওয়ান রিদম'।

আর্মাদিলো

সত্যজিৎ রায়ের অমর সৃষ্টি লালমোহনবাবু ওরফে জটায়ুকে তোমরা সবাই চেনো। একবার আর্মাদিলোর ডিমের ডালনা খেতে চেয়েছিলেন লালমোহনবাবু। কিন্তু এই আর্মাদিলো প্রাণিটা

কী? বহু বছর পরে আবার আমাদের সঙ্গে পরিচয় হল আর্মাদিলোর, বিশ্বকাপ ফুটবলের হাত ধরে। এই আর্মাদিলো এক বিশেষ ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণি। এটির গায়ে তিনভাগে ভাগ করা তিনটি খোলস থাকে। ভয় পেলে এই প্রাণিটি গুটিয়ে একটি বলের আকার ধারণ করে। পরিবেশবিদরা জানাচ্ছেন, গত ১০ বছরে এই শান্ত, নিরীহ প্রাণিটির সংখ্যা প্রায় অনেকটাই কমে গিয়েছে। এবারের বিশ্বকাপে 'ফুয়েলকো' ম্যাসকট এই আর্মাদিলোকেই সামনে রেখে তৈরি হয়েছে। পরিবেশ সম্পর্কে বিশ্ব ও দেশবাসীকে সচেতন করার ভালো প্ল্যাটফর্ম বিশ্বকাপের থেকে উপযুক্ত আর কী-ই বা হতে পারে? পরিবেশ সচেতনতার প্রতীক এই ফুয়েলকো ম্যাসকট।

জনপ্রিয়তা

মজার কথা হল, সামার অলিম্পিকে ফুটবলের জনপ্রিয়তার অভাবের কারণে ক্রীড়াসূচি থেকে বাদ গিয়েছিল। তখন ফিফার প্রেসিডেন্ট প্রথম বিশ্বকাপ আয়োজনের ব্যবস্থা করেন। আজকে এই খেলার জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত।

লিওনেল মেসি

মেসির যেটা সবচেয়ে বড়ো প্লাস পয়েন্ট সেটা হল ওর গোল করার অসাধারণ ক্ষমতা। চোখের পলকে যে রকম সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তেমনি কালেভদ্রে গোল ফস্কায়। ২০০৯ থেকে ২০১২ পর্যন্ত টানা ৪বার 'বালঁ দ্য অর' জিতেছেন। ২০০৬ ও ২০১০ বিশ্বকাপে মেসি খেলেছেন ৮ ম্যাচ। তাতে জয় ৬, হার ১, ড্র ১, গোল ১। বার্সিলোনার হয়ে ৪৩ ম্যাচে ৪১ গোল। মেসির ২০০৫ থেকে দেশের জার্সিতে ৮৩ ম্যাচে ৩৭ গোল। বাঁ পায়ের তীব্র শট যে কোনো সময়ে বিপক্ষের কাছে শংকার কারণ। মারাদোনা-খ্যাত ১০ নম্বর জার্সিও এখন মেসির গায়ে। নিজে যেমন গোল করার ক্ষমতা রাখেন তেমনই গোল করিয়ে নেওয়াতেও মেসি অদ্বিতীয়। অনেকে বলছেন ২০১৪-র বিশ্বকাপ হবে মেসির।

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

বিশ্বজুড়ে ফুটবল সমর্থকরা কয়েকভাগে বিভক্ত। তার একভাগ যদি মেসির সমর্থক হন তাহলে সমসংখ্যক সমর্থক ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে সমর্থন করেন। পর্তগাল দলের অসাধারণ এই খেলোয়াড়টি মাত্র ৮বছর বয়সে পেশাদারী ফুটবল কেরিয়াল শুরু করেছিলেন এবং মাত্র ১৭ বছর বয়সে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে যোগদান করেন। ডেভিড বেকহ্যাম ম্যান ইউ-তে ৭নং জার্সি পড়ে খেলতেন। সেই জার্সি গায়ে তুলে নেন রোনাল্ডো। নাম হয় 'সি আর সেভেন'। এই ক্রিশ্চিয়ানো এখন পর্তুগালের অধিনায়ক, দেশের হয়ে ১১০ ম্যাচে ৪৯টি গোল সেই দেশের ক্ষেত্রে একটা রেকর্ড। কিন্তু গত বিশ্বকাপে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী খেলতে না পারায় সমর্থকদের মন ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু এই বছরে আবার চূড়ান্ত ফর্মে রয়েছেন তিনি।

নেইমার

ব্রাজিলের বিখ্যাত ক্লাব স্যান্টোস দলের ইউথ অ্যাকাডেমিতে মাত্র ১০ বছর বয়সে নেইমারের পদার্পণ। গরীব পরিবারে জন্ম নেওয়া এই খেলোয়াড়টি মাত্র ১৯ বছর বয়সে দক্ষিণ আমেরিকার সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পান।

ব্রাজিলের বুকে এখন পরিচিত ফুটবলের বিস্ময়বালক হিসেবে। ২০১২ সালে প্রায় একাই দেশকে জিতিয়েছেন কনফেডারেশনস' কাপ। সেই কারণেই আবার সাম্বার ছন্দে নেচে উঠবে বিশ্বকাপের আঙিনা। সেই আশাতেই বুক বেঁধে রয়েছেন অগণিত ব্রাজিল তথা নেইমার সমর্থকরা।

বিশ্বকাপ

১৯৩০ সাল থেকে বিশ্বকাপ চালু হলেও ১৯৪৬ সাল থেকে ফিফা সভাপতি জুলে রিমের নামানুসারে বিশ্বকাপের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় জুলে রিমে কাপ। এই কাপের নকশা করেছিলেন অ্যাবেল ল্যাফলর। কিন্তু লন্ডনের এক প্রদর্শনী থেকে ১৯৬৬ সালে কাপটি চুরি হয়ে যায়। দক্ষিণ লন্ডনের একটি বাগান থেকে কাপটি উদ্ধার হয়। কিন্তু ব্রাজিল ৩বার কাপটি জিতে চিরকালের করে নেওয়ায় ১৯৭০ থেকে নতুন কাপের প্রবর্তন হয়, নাম দেওয়া হয় 'ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ'। উল্লেখ্য, নতুন এই কাপের ওজন ৪,৯৭০ গ্রাম। রয়েছে ১৮ ক্যারেটের সোনা।

অ্যাওয়ার্ড

বিশ্বকাপে চালু রয়েছে বিভিন্ন ধরণের পুরস্কার বা অ্যাওয়ার্ড। এসো দেখে নেওয়া যাক কোন কোন অ্যাওয়ার্ড ফুটবলের এই বিশ্বযুদ্ধে চালু আছে।

গোল্ডেন বল : এক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যম হচ্ছে চূড়ান্ত বিচারক। সেরা খেলোয়াড় পান গোল্ডেন বল। বিচারে দ্বিতীয় ওবং তৃতীয় স্থানাধিকারীর প্রাপ্য যথাক্রমে রুপো ও ব্রোঞ্জের বল।

গোল্ডেন বুট : সর্বোচ্চ গোলদাতা এই পুরস্কার পান। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা পান রুপো ও ব্রোঞ্জের বুট।

গোল্ডেন গ্লোভস্ : এই পুরস্কার পেয়ে থাকেন সেরা গোলরক্ষক। বিচারক হিসেবে থাকেন ফিফার টেকনিক্যাল স্টাডি গ্রুপের সদস্যরা।

ফিফা ফেয়ার প্লে ট্রফি : গোটা বিশ্বকাপে নিয়মনিষ্ঠ ও পরিচ্ছন্ন ফুটবল খেলার জন্য ফিফা কোনো দেশকে এই পুরস্কার দিয়ে থাকে। এতে খেলার মধ্যে ফাউল বা অন্যান্য বিষয়গুলিকে বিচার করে পুরস্কার প্রাপক দেশের নাম ঠিক করা হয়।

বেস্ট ইয়ং প্লেয়ার অ্যাওয়ার্ড : সেরা অনূর্ধ ২১ খেলোয়াড়ড় এই পুরস্কার পেয়ে থাকেন। বিচারক হিসেবে থাকেন ফিফার টেকনিক্যাল স্টাডি গ্রুপের সদস্যরা।

মোস্ট এন্টারটেনিং দল : এক্ষেত্রে বিচারক দর্শকরা। দর্শকদের ভোটে নির্বাচিত দেশ এই পুরস্কার পেয়ে থাকে।

বলের নাম

১৯৭০ সাল থেকে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলিকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে বলের নকশা তৈরি করার দায়িত্ব পায় বিশ্বখ্যাত কোম্পানি অ্যাডিডাস। তারপর থেকেই বিভিন্ন বিশ্বকাপে বিভিন্ন নামের বল চালু করা হয়েছে। এসো দেখে নেওয়া যাক কোন বিশ্বকাপে বলের কী নাম ছিল।

সাল	নাম
১৯৭০ এবং ১৯৭৪	টেলস্টার
১৯৭৮ এবং ১৯৮২	ট্যাঙ্গো
১৯৮৬	অ্যাজতেকা
১৯৯০	এতরুসকো ইনিতো
১৯৯৪	কোয়েস্ত্রা
১৯৯৮	ট্রিকোলর
২০০২	ফেভারনোভা
২০০৬	টিমজিস্ট
২০১০	জাবুলানি
২০১৪	ব্রাজুকা

শতাব্দীর সেরা

১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে ছ'জন বিপক্ষের খেলোয়াড়কে কাটিয়ে আর্জেন্টিনার হয়ে মারাদোনার করা গোলটি সবারই মনে আছে। যদি এখনো না দেখে থাকো তাহলে যেভাবে হোক সংগ্রহ করে সেই ভিডিও দেখে নিও, কারণ ফিফার ওয়েবসাইটে সেই গোলটিকে 'গোল অফ দি সেঞ্চুরি' বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

পাহাড়ের জীবনযাত্রা

এই পৃথিবী বড়ই বৈচিত্রময়। এই বৈচিত্র ধরা পড়ে মানুষের ভাষা, খাদ্য, পোশাক ও জীবনযাত্রায়। জীবনযাত্রা নির্ভর করে প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর। সমতল ভূমির জীবনযাত্রা যেমন আরামপ্রদ ও বিচিত্র, পাহাড়ের জীবনযাত্রা, ঠিক তার বিপরীত। ভারতবর্ষ নদ-নদী, সমুদ্র, জঙ্গল ও পাহাড়ের বিচিত্রতায় মোরা। পশ্চিমবঙ্গে ডুয়ার্স, দার্জিলিং, সিকিমের গ্যাংটক। এছাড়াও

কাশ্মীর, নৈনিতাল, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাহাড়-পর্বতের মানুষদের জীবনযাত্রা তুলনা করলে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পাহাড়ে লোকবসতি কম, চাষবাসের সুযোগও খুব একটা নেই। এখানকার মানুষেরা অতি কষ্টে ঝুম চাষের মাধ্যমে শস্য ফলায়। ছোটো খাটো কুটির শিল্প, বনজ সম্পদ এখানকার মানুষদের জীবিকার উপায়। পাহাড়ি মানুষদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার খুব বেশি হয়নি। বেশির ভাগ মানুষ গরীব ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এখানকার মেয়েদের মধ্যে বাল্যবিবাহ খুবই প্রচলিত। তবে পাহাড়ি মানুষেরা খুবই কষ্টসহিষ্ণু। তাদের জীবনযাত্রা সহজ-সরল। পাহাড়ি অঞ্চলে মানুষদের সবসময় বিপদসঙ্কুল অবস্থার মধ্যে বসবাস করতে হয়। তার মধ্যে অতিরিক্ত বৃষ্টি, ভূমিকম্প, ধ্বস ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। যে সমস্ত পাহাড়ি অঞ্চলে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে সেখানকার মানুষরা কিছুটা স্বচ্ছল জীবনযাত্রা যাপন করতে পারে। অন্যত্র অবস্থা তথৈবচ। সমতলভূমিতে যেমন শধদূষণ, বায়ুদূষণ, জলদূষণ মানুষের জীবনকে অস্থির করেছে, পাহাড়ি অঞ্চল তা থেকে অনেকাংশে মুক্ত। এখানকার মানুষের মোবাইলের রিংটোনে নয়, পাখির কাকলিতে ঘুম ভাঙে। এখানকার বিভিন্ন ঋতু খুবই বৈচিত্রময়। পাহাড়ি আদিম মানুষেরা তাদের ধর্মকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। বিভিন্নি উৎসব অনুষ্ঠানে ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটে। পাহাড়ি ও সমতলভূমির মানুষদের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য ধরা পড়ে অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও সামাজিক পটভূমিকায়। তাই জন্য পাহাড়ি মানুষেরা অনেক সময় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা স্বশাসন দাবি করে। সরকারের উচিৎ এই দুই স্থানের পার্থক্য দূর করা। পাহাড়ি শান্তিকামী মানুষেরা যাতে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে। যাতে পাহাড়ের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে তা প্রতিটি সরকারের দেখা উচিত।

সৌম্যদীপ্ত পাল
শ্রেণি : ষষ্ঠ
মাহেশ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়

আমার স্বাধীনতা দিবস

দিনটা ছিল বুধবার। ঘুম ভেঙে গেল 'বন্দেমাতরম' গানে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পরলো যে আজ ১৫ আগস্ট। ভারতের স্বাধীনতা দিবস। জানালা দিয়ে দেখলাম সব ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে পতাকা নিয়ে নিজেদের স্কুলে যাচ্ছে। তখনই আমি স্নান করে পতাকা নিয়ে মায়ের সঙ্গে স্কুলে গেলাম। স্কুলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেল পতাকা উত্তোলন উৎসব। সমস্ত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও বেশির ভাগ ছাত্ররাই উপস্থিত সেখানে। প্রধান শিক্ষক পতাকা উত্তোলনের আগে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু বক্তৃতা দিলেন। আমার শুনে খুবই ভালো লাগল। তারপর পতাকা উত্তোলন করা হল। তখন আমরা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললাম 'বন্দেমাতরম'। তারপর জাতীয় স্তোত্র পাঠ শেষ হল। বাড়ি ফেরার সময় হয়ে এল। দিনটা ছিল পড়াশোনা থেকে মুক্ত। আমি মনে করলাম আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। মনে পড়ল মহাত্মা গান্ধিকে। আজও ভুলতে পারি না ছবিতে দেখা মৃত্যুহীন নেতাজির উজ্জ্বল চোখ দুটি। আমাদের দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে বাবাকে কিছু প্রশ্ন করলাম, বাবা সব প্রশ্নের উত্তর দিল এবং আমার শুনে খুবই ভালো লাগল। আমার মনে হয় দিনটিতে শুধু ছুটির মজা না নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা মনে করা ও দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু চিন্তা করার পাশাপাশি তাঁদের মতো নিজেদের গড়ে তোলার শপথ নেওয়াও দরকার।

সৌম্যদীপ্ত পাল
শ্রেণি : ষষ্ঠ,
মাহেশ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়

'কচি পাতা'র পাতায় পাঠাতে পারো তোমাদের লেখা ছড়া, অণুগল্প, লিমেরিক বা তোমাদের কোনো অভিজ্ঞতার কথা। আমরা গুরুত্ব দিয়ে ছাপবো সেই লেখা। পাঠাতে পারো ছবিও।
লেখা ও ছবি পাঠানোর ঠিকানা -
কিচির মিচির
৯ কৈলাশ ব্যানার্জি লেন, হাওড়া - ৭১১ ১০১। পাঠাতে পারো ই-মেলেও।

আঁকি-বুঁকি

অরিত্র ঘোষ
শ্রেণি - প্রথম,
বি টি রোড গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড হাই স্কুল
কলকাতা

অন্তরা বিশ্বাস
শ্রেণি - নবম,
নবগ্রাম হীরালাল পাল বালিকা বিদ্যালয়
নবগ্রাম, হুগলি

সৃজনী দাস
শ্রেণি - পঞ্চম,
কন্টাই পাবলিক স্কুল
পূর্ব মেদিনীপুর

তোমাদের জন্য এই প্রতিযোগিতা। প্রতি সংখ্যায় আমরা দেবো একটি কাল্পনিক বিষয়। তোমাদের কাজ হবে সেই বিষয়ের ওপর ২০০ শব্দের মধ্যে লিখে আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া। চুপিচুপি বলে রাখি, বাবা-মা বা বড়োদের সাহায্য নিলেই কিন্তু আমরা বুঝতে পেরে যাবো। লেখা হলেই আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও। খামের ওপর লিখবে -

মেলে দিলেম ইচ্ছেডানা
প্রযত্নে - **কিচির মিচির,**
৯, কৈলাশ ব্যানার্জি লেন, হাওড়া - ৭১১ ১০১

পাঠাতে পারো ই-মেল করেও। আমাদের ই-মেল - kichirmichirkol@gmail.com। লেখা পাঠাতে হবে ফুলস্কেপ কাগজের একপিঠে। দু'পাশে যথেষ্ট ছাড় দিয়ে ৬ জুন-এর মধ্যে। নাম, ফোন নম্বর, ঠিকানা, বিদ্যালয়ের নাম, শ্রেণি পরিস্কার করে উল্লেখ করবে।

: প্রতিযোগিতার বিষয় :
বিশ্বকাপে তুমিই মেসি-রোনাল্ডো

কিচির মিচির-এর পক্ষে রিমা ঘোষদস্তু কর্তৃক ৯, কৈলাস ব্যানার্জি লেন, হাওড়া - ৭১১ ১০১ থেকে প্রকাশিত এবং তাজ এন্টারপ্রাইজ, ৬ মণীন্দ্র মিত্র রো, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : সুদীপ্ত চক্রবর্তী।
E-mail : kichirmichirkol@gmail.com, সম্পাদনা ও বিজ্ঞাপন : ৯৮৩০০৭৭২০৫/৯৩৩০৮০৮৯০০, বিপণন : ৮০১৭১৫৫৪১৭ Title registration - WBBEN14929/25/1/2014-TC.